শ্রীকেশব-কাহিনী

১২৪ (৭৭)
২৫

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের
ভূতপূর্ব্ব সহকারী ইন্‌স্পেক্টর

শ্রীমতিলাল দাশ, বি. এ.
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

মঙ্গলকুটীর, বিধানপল্লী, রমণা, ঢাকা
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯৪৩

বিজ্ঞপ্তি

ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া "শ্রীকেশব-কাহিনী" প্রকাশিত হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, ভক্তি ও যোগ সম্পর্কে কথা ও কাহিনী অতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহার জীবনে "নব-বিধানের" স্বাভাবিক সঞ্চার ও ক্রম-বিকাশ ইঙ্গিতে প্রদর্শন করা। তাঁহার স্বদেশ-ভক্তি, সমাজ-সেবা, শিক্ষা-নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে বিবৃতি পরে বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ব্রহ্মানন্দদেবের যে সুন্দর লখ্য এই গ্রন্থের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ার প্রীতিভাজন ধর্ম্মবন্ধু অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এস্-সি. মহাশয়ের আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সহানুভূতির । এই পবিত্র উপহারের জন্য আমি তাঁহার নিকট চির-ণী রহিলাম।

গ্রন্থকার

চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের
মানসপুত্র
সাধু প্রমথলালের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থ
শ্রদ্ধার সহিত
অর্পিত হইল।

শ্রীমতিলাল দাশ

B14927

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—শ্রীকেশব ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঃ—

পঞ্চম অধ্যায়—বিশ্বাস বিজয় ঃ—

ষষ্ঠ অধ্যায়—আচার্য্য-পদে অভিষেক ও পরীক্ষা জয় ঃ—

সপ্তম অধ্যায়—বিশ্বাসের পথ স্বতন্ত্র, গতি অনন্ত ঃ—

অষ্টম অধ্যায়—নববিধানের ক্রমোন্মেষ :—

নবম অধ্যায়—কেশব-দ্রোহীদলের আবির্ভাব :—

দশম অধ্যায়—বিশ্বাস শান্ত ও উদার :—

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বাসের বিচিত্র প্রকাশ
(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান) ঃ—

দ্বিতীয় স্কন্ধ---প্রেম-লীলা।

দ্বাদশ অধ্যায়—প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ ঃ—

ত্রয়োদশ অধ্যায়—"অসাধারণ উদার প্রেম" :—
(কথা ও কাহিনী)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—"টানা জাল" :—

পঞ্চদশ অধ্যায়—প্রাচ্য ও প্রতীচীর মিলন :—

ষোড়শ অধ্যায়—জীবে দয়া :—

সপ্তদশ অধ্যায়—নীরব প্রেম :—

অষ্টাদশ অধ্যায়—দল সাধন :—

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ প্রণীত—

১। **শ্রীকেশব-সমাগম** (নববিধান জুবিলী সংস্করণ)। এই গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনতত্ত্ব সহজ ভাষায় বিবৃত। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সুধিগণ কর্ত্তৃক আদৃত ও প্রশংসিত। মূল্য সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কমাইয়া একটাকা হইতে বার আনা।

২। **গন্ধপুষ্প**—(মহাত্মা কালিপ্রসন্ন ঘোষ কৃত ভূমিকা সহ) প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। নূতন সংস্করণ বাহির করার উদ্যোগ চলিতেছে। মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। **শ্রীকেশব-কাহিনী** (কেশব-জীবনের কথা ও কাহিনী)—এই মাত্র প্রকাশিত। কেশবজীবনের বহু নূতন কাহিনী সংগৃহীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

৪। **নমোদেব!** (ধর্ম্মবিষয়ক নূতন কবিতা পুস্তক)—প্রেসে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—(১) মঙ্গল-কুটীর, বিধান-পল্লী, রমণা, ঢাকা, গ্রন্থকারের নিকট।

(২) ৮৯, মাছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, নববিধান পাব্লিকেসন কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি. এস-সি, মহাশয়ের নিকট।

শ্রীকেশব-কাহিনী

—)*(—

অবতরণিকা।

সার্ব্বজনীন নববিধান-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার পরে প্রায় ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল মাঝে মাঝে পুণ্য-ভূমি কলিকাতায় গমন করিয়া নবযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমাধি দর্শন করা, এবং "ঋষি" গৌরগোবিন্দ, "মৌলানা" গিরিশচন্দ্র, "প্রেমদাস" ত্রৈলোক্যনাথ, ভক্ত উমানাথ, সেবক কান্তিচন্দ্র প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় প্রেরিত বৃন্দের পদতলে বসিয়া তাঁহাদের মুখনিসৃত নবধর্ম্মতত্ত্ব-সুধা পান করা। এই নমস্য সাধুগণ ব্রহ্মানন্দ দেবের জীবন ও চরিত্র অবলম্বনে এমন সরল, সহজ ও মধুর ভাবে গল্প করিতেন যে আমার হৃদয় তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইত। ক্রমে কি জন্য জানিনা, তাঁহাদের কথা আমার "ডায়ারিতে" সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম। চট্টগ্রামে অবস্থান কালীন নববিধানের সুসংবাদ-লেখক শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারী-মোহনের নিকট হইতেও কেশবজীবনের হৃদয়গ্রাহী বৃত্তান্ত কম সংগ্রহ করি নাই।

কিছু দিন ধরিয়া এই ভাবে চলিতে চলিতে আমি এমনই একটী নেশার দাস হইয়া পড়িলাম যে শ্রীকেশবের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তি-লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াই হউক, কিম্বা তাঁহাদের লিখিত কোন গ্রন্থ অথবা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই হউক, এই ভক্ত-জীবনের কোন নূতন বার্ত্তা অবগত হইলেই অমনি তাহা "নোট্" করিয়া রাখিতাম। ক্রমে যখন দেখিলাম যে এই পন্থা অবলম্বনে কেশবচরিত্রের অনেক দুর্লভ তথ্য ছোট ছোট সাঙ্কেতিক আখ্যানের আকারে সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে অন্তরে প্রকাশিত আদর্শ অনুসারে একটী অখণ্ড বস্তুরূপে খাড়া করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। "শ্রীকেশব-কাহিনী" এই ইচ্ছারই ফল।

সত্যের খাতিরে ইহা বলিতেই হইবে যে ব্রহ্মানন্দ-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা শ্যামল কুঞ্জের অন্তঃস্থলে প্রস্ফুটিত যুই ফুলের ন্যায় শুভ্র, সরস ও সৌরভময়। যদি আমার ভাষাটীকে ভাবের প্রতিধ্বনিরূপে স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারিতাম তবে কতই আনন্দের বিষয় হইত! কিন্তু আমার সেই শক্তি কোথায়? তত্রাপি জীবনব্রত পালনের জন্য ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম-কৃপা, নিম্নে ব্রহ্মানন্দ-বাণী, এই দুইটীকে পরম সহায় রূপে গ্রহণ করিয়া, যে ভাবে পারিলাম এই গ্রন্থ বাহির করিলাম। যদি সহৃদয় পাঠকগণ মনে করেন যে এই "কাহিনীর" ভিতর দিয়া নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আসল মূর্ত্তিটী

অস্পষ্ট আকারে হইলেও ফুটিয়া উঠিয়াছে, তবে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হউক! শ্রীকেশবের প্রত্যাদিষ্ট বাণী জয়যুক্ত হউক!

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মৎপ্রণীত "শ্রীকেশব-সমাগম" নামক গ্রন্থে কেশবজীবনের যে সকল তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি, এই গ্রন্থে প্রকাশিত কাহিনী তাহাদেরই দৃষ্টান্ত। প্রকৃত পক্ষে, স্বর্গের এক একটী সত্য যখন "বিধানের" গুণে চরিত্রগত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তখনই তাহা ঘটনার আকারে বাহিরে আসিয়া দেখা দেয়। "কাহিনী" আর কি?

মঙ্গল-কুটীর,
বিধান-পল্লী,
রমনা, ঢাকা।

শ্রীমতিলাল দাশ

সোণার কমল।

হৃদয়-কুঞ্জে বসিয়ে, নাথ,
বাজাও লীলার বাঁশী,
নিত্যলোকের সত্য জীবন
পলকে উঠিবে হাসি !
নববিধানের মৃতসঞ্জীবন
অমৃত কিরণ পরশে
ফুটিবে সোণার কেশব-কমল
বিমল ভক্তি-সরসে !

শ্রীকেশব-কাহিনী।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রম।

"চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলি কেন?"—শ্রীকেশব (৩০ পৌষ, ১৮০২ শক)।

"অপ্রকাশ-সন্তান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছিল, অব্যক্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং পিতা হইতে পিতার মূর্ত্তি লইয়া, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটী স্বরূপ লইয়া পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। পিতার ইচ্ছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশিত হইল।"—শ্রীকেশব (সেবকের নিবেদন)।

ক। বংশ পরিচয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বংশ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা দুঃসাহসের কার্য্য। এই সম্পর্কে পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ বিবরণের সঙ্গে তাঁহার আত্ম-কথার একটুও মিল নাই। আমি এখানে এই দুইটী বর্ণনাই প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম।

(১) ইতিহাসের কথা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ) তারিখে প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় একটি দেবশিশু প্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লালসেনের বংশে কলিকাতামহানগরীর সম্ভ্রান্ত সেন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বিধাতার বিধান-রহস্য মানব-বুদ্ধির অগম্য। ধনে জনে পরিপূর্ণ এমন সোণার সংসার, রাজপ্রাসাদ তুল্য এমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা; তবুও শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইলেন "স্বেত্‌খানার" সংলগ্ন এক অতি কদর্য্য অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গৃহে। ইনিই পৃথিবীর সর্ব্বত্র "শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন" নামে পরিচিত ও পূজিত।

বঙ্গের সুসন্তান বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামকমল সেন এই শিশুর পিতামহ। মহীয়ান্ পৌত্রের মহীয়ান্ পিতামহ। অসামান্য প্রতিভাবলে অতুল বৈভবের অধীশ্বর হইয়াও মহাত্মা রামকমল ফকিরের ন্যায় জীবন-যাপন করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি স্বহস্তে সিদ্ধপক্ক হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়াও অনেক সময় পেয়ারা ভাতে দিয়া তাহাই তৃপ্তির সহিত খাইতেন। তাঁহার অসাধারণ বদান্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও হরিভক্তি সম্পর্কে কলিকাতার "ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্" লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "কেশবচন্দ্র" নামক গ্রন্থে এক উপাদেয় বিবরণ বাহির

পিতামহ
রামকমল সেন

হইয়াছে; আমি ইহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

"রামকমল সেন 'গোড়া বৈষ্ণব'। একথা বলিতে এখন আমরা যা বুঝি সে রকম নহে, প্রকৃত বিষ্ণুভক্তের যা কিছু থাকা উচিত সে সকল সদ্‌গুণই তাঁহার যোল আনা রকম ছিল; সুতরাং গৃহে নিষ্ঠাচার, পবিত্রতা, দেব-আরাধনা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত;—বারো মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই ছিল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মধুর হরিনামের রোল উঠিয়া সে-পল্লীটি মাতাইয়া তুলিত, তাহাতে অনেক লোক আকৃষ্ট হইয়া সেখানে জড় হইতেন।

"তিনি বৈষ্ণব—হরিনাম শুনিলেই গলিয়া যাইতেন, সমস্ত প্রাণীকেই ঈশ্বরের সন্তান ভাবিতেন, সুতরাং প্রাণ দিয়া লোক-সেবা করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য ভাবিতেন এবং ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে সর্ব্ব জীবের প্রতি ভালবাসা তাঁহার জীবনের প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"গাছ যেমন, ফলও তেমনি হইয়া থাকে। সংসারের কর্ত্তার স্বভাব চরিত্র ও প্রকৃতি যেমন, লোকজনও তেমনি হয়। রামকমলের আদর্শে তাঁহার সংসারও ধর্ম্মের সংসার—পুণ্যের সংসার হইয়া উঠিল। নিত্য উৎসব, নিত্য হরিনাম, নিত্য অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, নিত্য দান-দক্ষিণা ক্রিয়া-কলাপ চলিতে লাগিল। সুতরাং দেশের মধ্যে রামকমল সেনের নাম-ডাক না পড়িবে কেন?"

এই মহানুভব পুরুষ দেশের উন্নতিকল্পে কিরূপ অদম্য উৎসাহের সহিত নানা বিভাগে নানা সংস্কার কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

মাতামহ
গৌরহরি দাশ

কবিরাজ গৌরহরি দাশ শ্রীকেশবের মাতামহ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, এবং সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। শক্তিমন্ত্রোপাসক হইলেও তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল, মদ্যমাংসাদি কখনও স্পর্শ করিতেন না। শুদ্ধাচার, নিষ্ঠার সহিত দেবার্চ্চনা, সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটন তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। মাতা সারদা তাঁহার তৃতীয়া কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অভয়াচরণ ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া তিনি কাশীতে গমন করেন এবং কথিত আছে, তথায় যোগাবস্থায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

পিতা
প্যারীমোহন সেন

দরিদ্রের বন্ধু মহামনাঃ দেওয়ান প্যারীমোহন সেন শ্রীকেশবের পিতা। তিনি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিলেন ; তাঁহার স্বভাবটীও ছিল বিমল ও কোমল, চরিত্রের ভূষণ ছিল নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও দয়া। তিনি তাঁহার পিতার অনেক গুণ পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অকাতরে দান করা, অথচ যাহাতে এই দানের ব্যাপার গুপ্ত থাকে সেইজন্য চেষ্টা করা তাঁহার প্রকৃতি-গত অভ্যাস ছিল। তিনি মাঝে মাঝে থলে ভরিয়া নূতন পয়সা, দুয়ানি, সিকি ইত্যাদি তাঁহার সহধর্ম্মিনী সারদা দেবীর হাতে দিতেন, এবং

বলিতেন, "এই সব তোমার ইচ্ছামত দীনদুঃখীকে হাতে করিয়া বিলাইয়া দেও।" সারদা দেবী কিন্তু ইহা করিতেন না, তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইত। তাহাতে প্যারীমোহন বলিতেন, "এখন বিলাইতেছনা বটে, শেষে পাবেনা, কেউ এমন করিয়া তোমায় দেবেনা।" বলা বাহুল্য যে স্বামীর এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই হঠাৎ ভগবানের ডাক আসিল, আর তিনি সকলকে কাঁদাইয়া আনন্দ-লোকে প্রস্থান করিলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে সারদা দেবীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন তাহা বড়ই হৃদয়-বিদারক। দেবীর পীঠে হস্ত রাখিয়া তিনি বলিলেন,—

"তুমি আমার কাছ থেকে যেওনা। তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম; এখন তুমিই বা কোথায় রইলে আর আমিই বা কোথায় চলিলাম!"—ইহাই পুণ্যশ্লোক প্যারীমোহনের শেষ কথা!

কেশব-জননী সারদা দেবীর নাম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গরীয়সী সাধ্বী ভারতমহিলার কথা আমি আর কি বলিব? প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি নববিধানের খ্যাতনামা সাধুগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অলোকসামান্য পূত চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। দেবী নিজেও

মাতা সারদা দেবী

ব্রহ্মচরণতলে বসিয়া তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষিত জীবনের করুণ কাহিনী এমন সরল সহজ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় "আত্ম-কথা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় দেব-ভাবে পূর্ণ হইয়া কি এক পুণ্যদীপ্ত প্রেমসুন্দর অভিনব বিশ্বাস-রাজ্যে প্রবেশ করে। তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার একটী চক্ষু সংসারের শোকদুঃখ দেখিয়া কাঁদে, কিন্তু অপর চক্ষুটী স্বর্গের দিকে তাকাইয়া হাসে। তাঁহার অসাধারণ জীবন প্রকৃতই স্বর্গের হাসি ও মর্ত্তের কান্নার আশ্চর্য্য মিলন-স্থল। অশ্রুজলের উপর যখন বিশ্বাসের বিমল বিভা প্রতিবিম্বিত হয় তখন নন্দনের অতুল শোভাও এই সৌন্দর্য্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

দেবী সারদা সর্ব্বপ্রকারেই স্বর্গের দেবী। সমস্ত ব্রাহ্ম-সমাজে কেন, ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু সমাজেও এমন একটী লোক পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ যাঁহার মস্তক এই ভক্ত-প্রসবিনীর পুণ্যনামে শ্রদ্ধাবনত না হইবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, বৌদ্ধ সাধু ধর্ম্মপাল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সেন্‌ডারলেণ্ড ও হারউড, ইন্দোরের মহারাজা টুকাজীরাও হুলকার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের পাপীতাপী দীনদুঃখী সকলেই যাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছেন তিনি যে বিশেষ ভাবে ভক্তির পাত্রী তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে?

শ্রীকেশব তাঁহার জননীকে কত যে ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন তাহার সাক্ষ্য সারদা দেবী নিজে এই ভাবে প্রদান করিয়াছেন,—

"তিনি [শ্রীকেশব] মাকে যে কত ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার শেষের ব্যামোতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর যখন খুব রোগ বাড়িত, আমি পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটিয়া যাইতাম, তিনিও সব সময় মা মা করিতেন। বাবুরা কিন্তু সব সময় আমাকে তাঁর কাছে যাইতে দিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, 'ডাক্তার মানা করিয়াছেন; আপনি যদি তাঁর নিকট যান তাহা হইলে তাঁর ব্যামো বাড়িবে।' আমি বলিতাম, 'আমার এই নিশ্বাসে কেশবের জন্ম, আমার রক্তে কেশবের দেহ, আমার নিশ্বাসে কখনও কেশবের অসুখ করিবে না, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দেও।' আমি অনেক সময় তাঁর ঘরের পাশেই পড়িয়া থাকিতাম। কেশব এক এক বার জাগিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিলে আমি ছুটিয়া যাইতাম। তিনি বলিতেন; 'মা, আমার কাছে বোস, আমায় কোলে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাক।' একদিন তিনি রোগযন্ত্রনায় খুব অস্থির হইয়াছিলেন; আমি দুঃখ করিয়া বলিলাম, 'কেশব, আমি কি পাপ করিয়াছি জানি না, তাহাতেই বুঝি তুমি এত কষ্ট পাইতেছ।' এই কথা শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তিনি বলিলেন, 'না মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এ রকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পাইয়াছি।'

এই বলিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন।”—আত্ম-কথা।

শ্রীকেশবের মহাপ্রস্থানের পরে পুত্রশোকবিধুরা জননী কোথায় গিয়া কি ভাবে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিতেন তাহার এক চিত্তাকর্ষক চিত্র মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র তাঁহার “Life of Keshab Chandra Sen” গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

“There is an awful calm about her aged brow since the death of her great son. Her form has not lost, but gained in dignity by her unspeakable sorrow.........Fervent and sweet-tempered in her piety always, there is a strange dignity and pathos in her prayers now which seems to be of another world. When she comes to Keshub's domestic sanctuary at times, and offers her sorrowing devotions, the whole congregation is melted to tears, and thrilled into awe. Truthful, tender, and sympathetic always, there is now a motherly kindness about her ways which few can forget. All, all who see her, whatever their feelings, whatever their differences, find a ready welcome. yet, she is identified in love with one only, from one source she draws her inspiration of goodness, and that is Keshub, her darling departed son.”

(২) শ্রীকেশবের আত্ম-কথা।

শ্রীকেশব মাঝে মাঝে আত্মপরিচয় দান করিতে গিয়া নিজের বাড়ী ঘর বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা এতই অদ্ভুত যে আমাদের নিকট হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। এই গভীর রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ভিতরের মর্ম্ম অবগত হওয়া সংসার-বাসীর পক্ষে অসম্ভব; কেননা এই বিশ্বাসাত্মা পুরুষের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়া চিদ্ঘন সত্য-রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

তাঁহার দুই একটি কথা শুনা যাক্। ভগবানকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

"হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে চিনাইয়া দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে সে কে? সে কেমন? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসাতে আসিয়াছ কেন?...... দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়িপাড়ায় বাসা করিয়া রহিলি? কার পুত্র —তোর বাপের নাম কি? ছিলি কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের পুত্র, এমন সব সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয়গ্রামে?......পৈত্রিক গৌরব, পৈত্রিক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিবনা। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে; মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়? হায়রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে

তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু ভাগবতী তনু,—দেব-তনু; পশু-তনুতে কাজ কি ?......তুমি হরি-সন্তান. ব্রহ্মপুত্র তুমি।”
—প্রার্থনা (৩০ পৌষ, ১৮০২ শক)।

শ্রীকেশবের এই প্রার্থনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি “ব্রহ্মপুত্র”, তাঁহার তনু “দেব-তনু” তাঁহার গৃহ “দেব-গৃহ”, সেই গৃহে অনেক “সোণার চাঁদ ভাই” বাস করেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল; “মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়” বাস করিতে তিনি একটুও আর ইচ্ছা করেন না।

তিনি যে কে এবং কি তাহা আবার এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

“জড় কি চিনি না, চিন্ময় বস্তু আমি। আমি আকাশ, আমি শূন্য, আমি পঞ্চভূতের অতীত। আমি অদ্ভুত; আমি ভূত নই, ভৌতিকের অতীত।......এ আমি ঘনীভূত, শক্তি-সামর্থ্যের অপ্রকাশিত প্রকাশক। প্রচ্ছন্ন পদার্থ, গুরুত্ব, সার, নীরেট।”— দৈনিক প্রার্থনা (১২।১।৮৩)।

ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

“তুমি আর আমি, বড় চিন্ময় আর ছোট চিন্ময়। বড় অদ্ভুত আর ছোট অদ্ভুত। স্মরণ করাও, ভগবান্। সেই অদ্ভুত দেশ যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ত্রীপুত্র নাই সেই দেশে আছি। সে দেশে দুটী পাখী থাকে ভাল।”— . . . দৈনিক প্রার্থনা (১২।১।৮৩)।

তিনি নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"চিন্ময় ভাই, তুমিই যথার্থ বস্তু। মানুষ তোমাকে জন্ম দেয় নাই। পবিত্রাত্মাজাত চিন্ময় পদার্থ, তোমার জন্ম প্রচ্ছন্ন। তোমার পিতা আকাশে। তুমি কিরণ, তুমি ভগবানের চিদাকাশে চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কর।"—দৈনিক প্রার্থনা (১২।১।৮৩)।

শ্রীকেশব তাঁহার উচ্চ বংশের কথা স্মরণ করিয়া ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছেন,—

"হে দীনবন্ধু, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদিগকে আমাদের উচ্চতা বুঝিতে দেও, মাহাত্ম্য জানিতে দেও। অনেক দিন বিদেশে থেকে আমাদের ঘরবাড়ী বংশ কুল ভুলিয়া গিয়াছি। ......এই যে উপাসনা কিসের জন্য? কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কাঁদের সঙ্গে ছিলাম, তাহা মনে করাইয়া দেয়। আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের দ্বারা কুল উজ্জ্বল। ......সে বন্ধুবান্ধবেরা কোথায় গেলেন? ঈশা মুষা কোথায় গেলেন? আমরা যে তাঁদের বংশ তা আর বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর আমাদের মহত্ত্ব স্মরণ করিতে দেও। আমরা এখানকার নয়, আমাদের বাড়ী এখানে নয়। অনন্ত যেখানে সেখানে আমাদের ঘর। জন্মিবার পূর্ব্বে সেখানে ছিলাম। ......সেই স্বর্গের বাস আর পৃথিবীতে বাস। কত তফাৎ! আমরা উচ্চ গোত্রের লোক, দেবি, তাই বিশ্বাস করিতে দেও।"—দৈনিক প্রার্থনা (২১।১০।৮১)।

এখানে দেখা যায় যে শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা, শ্রীমহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি সাধু মহাজনগণ যে উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীকেশবও সেই বংশেরই লোক। পৃথিবীতে যে কুল, বংশ, গোত্র ইত্যাদির কথা শুনি তাহা ভৌতিক,— এই আছে, এই নাই। কিন্তু শ্রীকেশব যে "উচ্চ বংশ" ও "উচ্চ গোত্রের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভূতাতীত বলিয়া নিত্যকাল ধারাবাহিক ক্রমে বিদ্যমান। এই অক্ষয় অজড় বংশের আদিপুরুষ অনাদি অনন্ত ভূমা মহান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

আর একটী বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীকেশব উপরে উদ্ধৃত প্রার্থনাটীতে "আমি" না বলিয়া "আমরা" বলিয়াছেন। ইহার ভিতরে যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে তাহা তাঁহার অন্য একটী প্রার্থনার সাহায্যে উদ্ভেদ করা যায়। সেই প্রার্থনাটী এই,—

"হে দয়াময়, হে বিধাতা, এই ভিক্ষা তোমার দাসের, তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তোমার রাজ্যে ফাঁকি ত চলে না, স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্তপদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।......

"দয়াময়, তাকে কখন কি বিদল করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ নাসিকা অঙ্গ সকলে।......

"নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ। শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু,—এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি।"—দৈনিক প্রার্থনা (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৮৮২)।

বহুকে আপনার ভিতরে আনিয়া এবং **আপনাকে** বহুর ভিতরে মিলনের সূত্ররূপে রাখিয়া যিনি **এক** তিনিই "নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ"। এই "প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ" কখনও **একবচন** নহে, চিরদিনই **বহুবচন**।

বিধাতার বিশেষ বিধি অনুসারে এই "সদল অখণ্ড" নবমানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাব ধর্ম্মরাজ্যের একটী বিরাট ব্যাপার। এই সম্পর্কে অনেক কথাই যথাস্থানে যথাসময়ে ক্রমে বলা আবশ্যক হইবে।

খ। নাম-রহস্য।

মহাত্মা রামকমল তাঁহার প্রাণাধিক পৌত্রটীর ভিতরে মহাপুরুষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত নাম রাখিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ"। এই নামটী অপ্রকাশ থাকিলেও ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহাভারতের যুগে যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতির উদ্ধার কল্পে যে মহাসমন্বয়ের বীজ ভগবানের নামে বপন করিয়াছিলেন হাজার হাজার বৎসর

পরে বিধান-ভারতের যুগে তাহা সমন্বয়াচার্য্য শ্রীকেশবের জীবনে শুধু যে অঙ্কুরিত হইল তাহা নহে, কিন্তু ফুলে ফলে শোভিত মহামহীরুহ রূপে গগনকে স্পর্শ করিল। শ্রীহরির লীলা খেলা কে বুঝিবে ?

শ্রীকেশব পৃথিবীর সর্ব্বত্র "কেশবচন্দ্র" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই নাম তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত। শ্রীকেশব এই নামটী কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার একটী কার্য্য হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি শেষ জীবনে নিজের ব্যবহারের জন্য একটী monogram প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; ইহাতে K. C. S. এই তিনটী অক্ষরের সঙ্গে Faith, Love এবং Purity, এই তিনটী শব্দ সুন্দর ভাবে মিলাইয়া দেওয়া হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে Faith, Love এবং Purity এই তিনের মিলনে যাহা হয় তাহাই K. C. S. অর্থাৎ "কেশবচন্দ্র সেন"। নবধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষাতে monogramটীর নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে এই বলিতে হয় যে ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা, এই তিন স্বর্গীয় উপাদানে নবযুগের উপযোগী একটী নূতন ভক্ত-চরিত্র রচনা করিলেন; সংসারে এই অভিনব ভক্তের নাম হইল "কেশবচন্দ্র সেন"।

"শ্রীকেশব-কাহিনী" এই মহাতিনেরই স্থূল লীলা-কাহিনী।

শ্রীকেশব-কাহিনী।

প্রথম স্কন্ধ।

বিশ্বাস-বিবৃতি।

"By faith we mean the science or the laws according to which divine dealings with human beings take place"

"Faith rises in the heart as an impulse sometimes, but bears testimony to itself in surrounding circumstances and surely achieves victory in the end. Nothing is so exact as faith".

Sree Keshub (The N. D.)

"Blessed be my god, I have seen Thee face to face, and heard Thy word of wisdom. Of this I am sure, of this I am absolutely certain.......How happy I am in my faith is known to Thee. O my heart's Delight, give me yet more faith, and may the joy of trust abound in me !"

Sree Keshub (Prayers)

"He that lives in Thee to have faith, is the master of untold treasure."—

Sree Keshub (Prayers)

"হরি, তুমি আমার বয়স, তুমি আমার বাল্য, তুমি আমার যৌবন, তুমি আমার বার্দ্ধক্য। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, অতএব তুমি আমার বয়সের সাগর। আমার মৃত্যু নাই, জীবনের ক্ষয় নাই।"—দৈনিক প্রার্থনা (১৯।১১।৮১)

"প্রকৃত ব্রহ্মতনয় কোন দেশে কিম্বা কোন কালে বদ্ধ নহে; ব্রহ্মতনয় অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার বাস-গৃহ।......হে ব্রাহ্ম, এই ব্রহ্মতনয়তত্ত্ব অতি অদ্ভুত তত্ত্ব, অতি মধুর তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সাধন কর।"—

শ্রীকেশব (সেবকের নিবেদন)

"হে আমি, জ্বলন্ত জীবন্ত পদার্থ, তুমি নাকি আমি? তুমি নাকি আমার দেহ নও, তুমি নাকি নিরাকার?......তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ এজন্য কৃতার্থ হলাম। তোমার শরীর নাই, আরও 'নাই' হোক্। স্বস্তি স্বস্তি করে করে সচ্চিদানন্দে লীন হউক। বড় সচ্চিদানন্দ আর ছোট সচ্চিদানন্দ।"—শ্রীকেশব (দৈনিক প্রার্থনা—১২।১।৮৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৈশবে বিশ্বাসের পূর্ব্বাভাস।

যে দুর্লভ বিশ্বাস-ধনে ধনী হইয়া শ্রীকেশব বিশ্বাসাত্মা পুরুষ (Man of Faith) রূপে ধর্ম্ম-জগতে পরিচিত, এবং যাহার অদ্ভুত মন্ত্রবলে তিনি নববিধানের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া ধরাবাসীকে মোহিত ও চমকিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বাভাস শৈশবেই বেশ পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ যে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেননা পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে শ্রীকেশবের জন্মগত নিত্য সম্বন্ধের ভিতরেই এই অভিনব বিশ্বাসের স্থিতি। ইহা যে কল্পনা নয় তাহা তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়;—

"আমি দেখিতেছি, জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বাটীতে গোলা। আমার হাতের ভিতরে তাঁহার হাত, আমার রসনার ভিতরে তাঁহার রসনা। আমার প্রাণের মধ্যে অনন্ত প্রাণ-বায়ু।...সন্দেহ আমার একটুও নাই; একটুও সন্দেহ থাকিলে বেদী হইতে বলিতাম না।"—জীবন বেদ।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ যখন এত নিবিড় ও নিগূঢ়, তখন বিশ্বাস প্রকৃতিগত না হইয়াই পারে না। আপনার

ভিতরে ডুবিলেই ভগবানের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করা যায়, চক্ষু খুলিলেই তাঁহাকে দেখা যায়, কাণ পাতিলেই তাঁহার বাণী শুনা যায়। সাক্ষী কেশব-জীবন।

শ্রীকেশবের বয়স যখন মাত্র ২½ বৎসর তখন একদিন তাঁহার পিতামহ মহাত্মা রামকমল সেন তাঁহাকে মাতৃক্রোড়ে আশ্চর্য্যভাবে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

মহাত্মা রামকমলের ভবিষ্যৎ বাণী

"এ সামান্য শিশু নয়। এ আমার বংশ উজ্জ্বল করিবে।"

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ রামকমলের ন্যায় দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন স্বভাবজ্ঞ পুরুষ যে শিশু কেশবের ভিতরে ভবিষ্যৎ নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মানন্দের আভাস প্রত্যক্ষ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ঐ যে গগনস্পর্শী পর্ব্বতচূড়ায় ফলফুলশোভিত স্বর্ণকিরণরঞ্জিত বিশাল তরু দর্শকের প্রাণে বিস্ময়-বিজড়িত মহাভাব সঞ্চার করিতেছে কে না জানে যে উহা এক সময় অতি ক্ষুদ্র একটী বীজের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতেছিল? ইহাও কি অভ্রান্ত সত্য নহে যে সামান্য একটী মুকুল ক্রম-বিকাশের পথে চলিতে চলিতে বিধিনির্দ্দিষ্ট সময়ে নয়নরঞ্জন বিশ্ববিমোহন সুরভি কুসুম রূপে প্রকাশিত হয়? বিজ্ঞানবিৎ যিনি তিনিই এই রহস্যময় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

শিশু কেশব দেখিতে এত সুন্দর ছিলেন যে সকলে তাঁহাকে "গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ

ফুলের ন্যায় তাঁহার কচি দেহখানি কমনীয় ও চিত্তহারী ছিল, একবার দেখিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না। এই দেবশিশুটী যখন প্রতিদিন স্নান করিয়া চেলীর কাপড় পরিতেন ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দনে হরিনামটী লিখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন তখন প্রকৃতই ধরাতলে বৈকুণ্ঠ অবতীর্ণ হইত! নবযুগের নবভক্তরূপে যিনি সংসারে অভ্যুদিত তাঁহার পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। সচ্চিদানন্দ শ্রীগোঁসাইজীব অপরূপ লীলাই বটে!

গোঁসাই

শ্রীকেশবের বাল্যসাথী মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার "Life of Keshub Chandra Sen" নামক গ্রন্থে বালক কেশব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"He was a fair, calm, good-looking boy; his simple boyish beauty was angelic."

কেশব-জননী সারদা দেবী শিশু কেশবের হরিনামে দীক্ষা সম্পর্কে "আত্ম-কথা" গ্রন্থে বলিয়াছেন —

"আমার শ্বশুর এ বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেকেই পাঁচ বৎসর হইলেই হাতে এক ছড়া তুলসীর মালা দিয়া হরিনাম দিতেন; কেশবকেও সে রকম দিয়াছিলেন। অন্য ছেলেরা সে নাম সর্ব্বদা করিতেন না। কেশব কিন্তু সে নাম ছাড়িতেন না, সেইটী বরাবরই ছিল। সব সময় তিনি হরিনাম লইয়া থাকিতেন, শেষে এই হরিনামে জগৎ মোহিত করিলেন।"

শিশু কেশবের হরিনামে দীক্ষা

হরিনামে স্বভাবজাত রুচি না থাকিলে এইরূপ হয় না।

শ্রীকেশবের বয়স যখন ৮ বৎসর তখন একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি সেন-পরিবারের পুরোহিত শ্রীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে "শ্যামসুন্দর" মূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন। পূজা শেষ হইলে নিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তিই ভোজনের স্থানে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গেলেন ; গেলেন না কেবল শ্রীকেশব ; তিনি কি এক রহস্যময় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেই কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখেই নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীকণ্ঠ বাবুর ১২ বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয় হরিচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ডাকিয়া নিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন যে এই ক্ষুদ্র বালকটী অনিমেষ নয়নে "শ্যামসুন্দরদেবের" মুখপানে তাকাইয়া আছেন। হরিচরণ আহারের জন্য অনেক বার ডাকিলেন, কিন্তু শ্রীকেশবের চৈতন্য নাই। অবশেষে হঠাৎ এই ভাবী যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছ মূর্ত্তির ভিতর কি আছে ?" হরিচরণ সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, "আমিতো কেবল পাথরের মূর্ত্তি দেখিতেছি।" শ্রীকেশব উচ্ছ্বসিত প্রাণে আবার বলিলেন,—

মূর্ত্তির ভিতরে "বস্তু"

"না গো না, উহার ভিতর বস্তু আছে, মাণিক আছে, জ্যোতিঃ আছে।"

কে জানে যে তখন এই জন্ম-বিশ্বাসী শিশুর ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সেই মূর্ত্তি দর্শনের পথ অবলম্বন করিয়া কোন্ মণিমুক্তা-খচিত জ্যোতির্ম্ময় মাধুরী-ধামে প্রবেশ করিয়াছিল !

(সাক্ষী হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়)

শিশু কেশব তাঁহার মাতার বড়ই বাধ্য ছেলে ছিলেন। তাঁহার এই বাধ্যতার মূলে বিশ্বাস। মা যাহা বলেন, যাহা করেন, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলের জন্য, এই বিশ্বাস শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এই বাধ্যতার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে।—

বিশ্বাস ও বাধ্যতা

কেশব-জননী সারদা দেবী একবার তাঁহার পরিবারের কয়েকটী মহিলাকে নিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গমন করেন; সঙ্গে ছিলেন ৫ম বৎসরের শিশু কেশব। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিলে সারদা দেবী কেশবচন্দ্রকে এক নিরাপদ স্থানে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "এখানে চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্, আর কোথাও যাস্‌নে।" তিনি নীরবে ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে গঙ্গাস্নানকার্য্য শেষ করিয়া সারদা দেবী তাঁহার আত্মিয়া মহিলাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরিলেন, শিশু কেশবের কথা তাঁহারা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। যখন গাড়ী বাড়ীর একেবারে নিকটবর্ত্তী হইল তখন কেশবচন্দ্রের কথা হঠাৎ জননী সারদার মনে পড়িল। তিনি কাঁদিয়া একেবারে আকুল হইলেন, কেবলই বলিতে লাগিলেন, "তার গলায় সোণার মালা, হাতে সোণার বালা, নিশ্চয়ই কেহ তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে!" বাড়ীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন সমস্ত গোলমালের কারণ জানিতে পারিয়াই নিজে গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়া গেলেন; চাঁদপালের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শিশু

কেশব যে স্থানে যে ভাবে তাঁহার মাতা তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানে সেই ভাবেই তখনও স্থির শান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হরিমোহন আনন্দে শিশুকে বুকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর মা ও জেঠীদের সঙ্গে কেন গেলিনা? তুই কি তাঁদের এখান থেকে যেতে দেখিস্‌নি?" শিশু কেশব উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি তাঁদের দেখেছি, কিন্তু মা যে বলেছিলেন তুই গোল করিস্‌না, এই স্থানে চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিস্‌।"

সহজ বিশ্বাস ও বাধ্যতার কি সৌম্য মূর্ত্তি! শ্রীকেশবের কন্যা মহারাণী সুচারু দেবী তাঁহার "ভক্তি-অর্ঘ্য" গ্রন্থে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের এক চিত্তহরণ চিত্র আঁকিয়া তাহার নিম্নে এই সুন্দর কথাটী লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"প্রশান্ত বালক স্থির করুণ নয়নে
চাহিয়া রহিল মুগ্ধ অসীমের পানে।
নড়িলনা একপদ গুরুবাক্য স্মরি,
চিত্রের পুত্তলি যথা রহে চুপ্‌ করি।"

বাঙ্গলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক, "ভারতবর্ষের" সুযোগ্য সম্পাদক, সর্ব্বজনপরিচিত রায় বাহাদুর জলধর সেন মহোদয় শিশু কেশব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"এই শিশু বয়সেই কেশবচন্দ্রের যে গুণটী বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা তাঁহার নির্ভীকতা। ভয়

বিশ্বাস ও নির্ভীকতা

কাহাকে বলে তাহা যেন তিনি জানিতেনই না। কেহ কোন বিষয় লইয়া ভয় দেখাইলে সেই জিনিষটার জন্যই তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাইত। এই সাহস তাঁহার জীবনকে চিরদিন সত্যের পথে ধরিয়া রাখিয়াছিল। যে সব খেলার সঙ্গী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা তাঁহার আধিপত্য স্বীকার না করিয়া পারে নাই। কেশবচন্দ্র পাড়ার ছেলেদের সর্দ্দার ছিলেন। কিন্তু সর্দ্দার হইলেও তাঁহার দ্বারা কখনও কাহারও অন্যায় সাধিত হয় নাই। বাড়ীর কর্ত্তাদের অনুকরণে ছেলেদের লইয়া তিনি সংকীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিলেন। তাহারা কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া 'হরি হরি' বলিয়া গান ও নৃত্য করিত। কেশবচন্দ্র তাহাদিগকে গুরুজনের কথা শুনিতে, পশুপক্ষী সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে, ভগবানকে ডাকিতে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে জীবনের প্রভাতেই তিনি সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।"— বঙ্গগৌরব।

শিশু কেশবের এই "নির্ভীকতার" মূলেও স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস। এক দিকে "বাধ্যতা," অন্যদিকে নির্ভীকতা; এই দুটীই প্রকৃত বিশ্বাসের বিশেষ লক্ষণ; তাই ইহা একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এই বিশ্বাসাত্মা পুরুষ শৈশব হইতেই সত্যকে জীবনের এক মাত্র নেতা রূপে স্বীকার করিয়া মহা তেজের সহিত অসত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন।

বালক কেশব মধ্যে মধ্যে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে গৌরিভা

গ্রামে যাইতেন। তিনি একবার বিজয়াদশমীর দিন বয়স্য-দিগকে লইয়া নগরকীর্ত্তন বাহির করেন।

অদ্ভুত কীর্ত্তনীয়া দল

কলার খোলার সাহায্যে খোল, এবং বাতাবি লেবুর খোসায় কর্ত্তাল প্রস্তুত করিয়া এক দল বালক কেশবের সঙ্গে ঐরূপ খোল কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে ও গান গাইতে গাইতে নাচিয়া নাচিয়া রাজপথে বাহির হইল। তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় ছেড়া ন্যাক্‌ড়ার টিকী বায়ুভরে দুলিতেছিল! এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া গ্রামের লোক সকল একেবারে অবাক! তাহারা তখন মনে করে নাই যে এই অদ্ভুত কীর্ত্তনীয়া দলের নেতা বালক কেশব একদিন সমস্ত ভারতকে হরিপ্রেমে মাতাইয়া তুলিবে! ভগবান মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য যাঁহাকে নূতন একটী বিধানের প্রবর্ত্তক রূপে সংসারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ কার্য্য খুবই স্বাভাবিক।

তৃতীয় অধ্যায়।

যৌবনারম্ভে বিশ্বাসের দিব্য প্রকাশ।

"Faith makes a man what he wants to become within the twinkling of an eye. How can faith and tearful prayer fail in anything?"—

Sri Keshub.

"Faith always means being guided by a present Deity. It is a realized providence."—

Sri Keshub.

ক। নবযুগধর্ম্মে দীক্ষা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকেশবের বিশ্বাস পবিত্রাত্মাজাত, তাই স্বভাবসিদ্ধ। শৈশবে ইহা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম দেশে সুপ্ত শিশুর ন্যায় স্থিতি করিতেছিল, যদিও দৈবাৎ ইহার গুপ্ত লাবণ্যের দুই একটী স্নিগ্ধ কিরণ-রেখা কখনও কখনও বাহির পথে আসিয়া লোকের মনকে চমকিত করিত। যৌবনের আরম্ভে করুণার আধার ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ভাবে এই অস্ফুট বিশ্বাসকে জড়ের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া

প্রত্যাদেশ ও প্রার্থনা

প্রত্যাদেশের অমৃতস্পর্শে শক্তিঘন তেজোময় মূর্ত্তিতে জাগাইয়া তুলিলেন, এবং নবযুগধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র প্রার্থনাতে দীক্ষিত করিয়া অনন্ত দেবজীবনের পথ খুলিয়া দিলেন, তাহা তিনি নিজেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রবাসকালীন এক বিরাট সভায় বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই বাণীর মূল্য ধর্ম্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং ইতিহাসের হিসাবে খুবই বেশী বলিয়া এখানে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

নবধর্ম্মের আদি মন্ত্রে দীক্ষা

"English education unsettled my mind, and left a void; I had given up idolatry, but had received no positive system of faith to replace it. And how could one live on earth without a system of positive religion? Atlast it pleased Providence to reveal Himself unto me. I had not a single friend to speak to me of religion, God and immortality. I was passing from idolatry into utter worldliness. Through Divine grace, however, I felt a longing for something higher; the consciousness of sin was awakened within me......Was there no remedy? Could I continue to bear life as a burden? Heaven said 'No! sinner, thon hast hope'; and I looked upward, and there was a clear revelation to me. I felt that I was not groping in the dark as a helpless

child, cast away by his parents in some dreary wilderness. I felt that I had a Heavenly Friend always near to succour me. God Himself told me this ; no book, no teacher, but God Himself in the secret recesses of my heart. God spoke to me in unspeakable language, and gave me the secret of spiritual life, and that was prayer, to which I owed my conversion."—

Lec. In England.

১২ বৎসর পরেও তিনি ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার সম্পর্কে ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদী হইতে এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন ;—

"ধর্ম্ম কি জানিনা ও ধর্ম্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই ; গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই ; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই ; জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ, 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই' এই শব্দ উচ্চারিত হইল। কেন প্রার্থনা করিব, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ... ...

ঈশ্বরই দীক্ষা গুরু

"আমাকে ঈশ্বর বলিতেন, 'তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর্। প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম।"— জীবন বেদ।

শ্রীকেশবের এই দুইটী উক্তি হইতে আমরা পরিস্কার বুঝিতে পারি যে ঃ—

নববিধানের মূল সত্য

(১) বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই যখন তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে মূর্ত্তি পূজার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আপনার ধর্ম্মহীনতা দর্শনে পাপবোধের বিষম জ্বালায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং মুক্তির পথ সংসারের কোথাও নাই বুঝিতে পারিয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তখন দয়াময় শ্রীহরি পবিত্রাত্মা রূপে তাঁহার চিহ্নিত সন্তানের প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া মধুর বচনে তাঁহাকে অভয় দান করিলেন, এবং প্রার্থনার মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নবযুগধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই প্রার্থনাতেই তাঁহার জীবন-সাধনা আরম্ভ, এবং ইহাতেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ ; তাই তিনি জগৎকে শুনাইয়া গেলেন,—

"প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা, তাহা।"—

জীবন বেদ।

(২) এই দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলেন যে ভগবান নিত্যবন্ধু রূপে তাঁহার জীবনের মূলে সদাকাল স্থিতি করিতেছেন ; তিনিই তাঁহার একমাত্র রক্ষক, উদ্ধারকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা। প্রাণেশ্বর রূপে নিত্য বর্ত্তমান যিনি তাঁহার খোঁজ করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না, তিনি দয়া করিয়া নিজেই দেখা দেন। তবে ভয় ভাবনা কিসের ? এই

সহজ ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীকেশবকে শেষ জীবনে গভীর অতলস্পর্শ যোগ-সিন্ধুতে ডুবাইয়াছিল।

(৩) ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত **ব্রহ্মবাণীই** শ্রীকেশবের এক মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র ; ইহাই তাঁহার বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ। ঐ শুন তিনি শেষ বয়সে কি বলিয়াছেন,—

"হে অন্তরাত্মা, আমার জীবনের কোন্ অংশে তুমি লুকাইয়া আছ, জানি না। কাণ শুনিতেছে, ভিতরে একখানা বেদ পাঠ হইতেছে, একখানা নূতন শাস্ত্র পাঠ হইতেছে। ...আমার অস্থির ভিতরে থাকিয়া কেবল স্বর দ্বারা পরিচয় দিতেছ। আমার অন্ধকার আত্মার ভিতরে থাকিয়া তুমি শব্দ করিতেছ। ...ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে যাই, দৈববাণী যেন কাণে লাগিয়াই আছে।"———জীবন বেদ।

(৪) শ্রীকেশব কোন দিনই মানুষকে গুরুর পদে বরণ করেন নাই, এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে কখনও কোন সম্প্রদায় বিশেষে যোগদান পূর্ব্বক কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। ঈশ্বরই তাঁহার একমাত্র জ্ঞানদাতা গুরু। তাঁহার দীক্ষা, শিক্ষা, পরিত্রাণ সমস্তই ভগবানের হাতে। জীবনের অতি প্রথমেও যা, শেষেও তা।

ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা শ্রীকেশবপ্রচারিত নবধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। অতএব এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে নবযুগের উপযোগী এই অভিনব ধর্ম্মবিধান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে **নববিধান**

নামে প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইয়া থাকিলেও কেশব-জীবনে ইহার প্রথম সঞ্চার হয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের অনেক পূর্ব্বে; তখন ব্রাহ্মসমাজের নাম পর্য্যন্ত তিনি জানিতেন না। ভগবান যাঁহাকে নববিধান-প্রবর্ত্তকরূপে সংসারে পাঠাইলেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। একটী বট-বীজ যেমন গোপনে অঙ্কুরিত হইয়া বহুকাল পরে গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড বৃক্ষের আকার ধারণ করে, **নববিধান** সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। উভয়ের ভিতরেই বিধাতার বিধিমতে ক্রম-বিকাশের একটী আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ধারা। আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই এই সম্পর্কে জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।

খ। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।

শ্রীকেশব লীলারসময় শ্রীহরির বিশেষ নির্দ্দেশে যৌবনের আরম্ভেই নবযুগধর্ম্মের আদিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রার্থনা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কি অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা তিনি এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"I felt profoundly the efficacy of prayer in my own experience. I grew in wisdom, purity and love. But after this I felt th

need of the communion of friends, from whom I might be enabled, in times of difficulty and doubt, to receive spiritual assistance and comfort. So, I felt that not only belief in God was necessary but I wanted a real brotherhood on earth. Where was this true Church to be found? I did not know. Well, I established in my earlier days a small fraternity, in my own house, to which I gave the somewhat singular but significant name of The Good Will Fraternity. I did not allow myself for one moment to harbour sectarianism, but preached to my friends these two doctrines——God our Father, every man our brother. When I felt that I wanted a church, I found that the existing sects and churches would not answer my purpose. A small publication of the Calcutta Brahmo Somaj fell into my hands, and as I read the chapter on 'What is Brahmoism?' I found that it corresponded exactly with the inner conviction of my heart, the voice of God in the soul. I always felt that every outward book must be subordinated to the teachings of the Inner Spirit,—that where God speaks through the Spirit in man all earthly teachers must be silent, and every man must

bow down and accept in reverence what God thus revealed in the soul. I at once determined that I would join the Brahmo Somaj, or Indian Theistic Church."——Lec. In England.

এই উক্তিও সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দেয় যে নববিধানের মূল সত্য বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি তাহার উপরই শ্রীকেশবের ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। যথা—

(১) যখন আদি গুরু ঈশ্বর কথা বলেন তখন সংসারের গুরুগণকে নীরব থাকিতে হইবে। বাহিরের ধর্ম্মগ্রন্থের কোন মূল্য নাই। সমস্তের উপরে প্রত্যাদেশ। মনুষ্যমাত্রই প্রত্যাদেশ লাভের অধিকারী।

(২) ভগবান প্রত্যাদেশ যোগে যাহা প্রকাশ করেন প্রত্যেক নরনারী তাহা অবনত মস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। সত্য-লাভের একমাত্র উপায় প্রত্যাদেশ।

নববিধানের মূল সত্য

(৩) শুধু ঈশ্বরকে মুখে স্বীকার করিলে চলিবে না, জীবন ও চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ভ্রাতৃমণ্ডলীও চাই। ঈশ্বর আমাদের পিতা, এবং প্রত্যেক নরনারী আমাদের ভ্রাতাভগিনী; পিতাকে নিতে হইলে ভ্রাতাভগিনীকেও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। ঊর্দ্ধে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পিতা রূপে অবস্থিত, এবং নিম্নে সমস্ত নরনারী তাঁহার পুত্রকন্যা রূপে একত্র মিলিত।

—ইহাই হইল শ্রীকেশবের "এক পরিবার"। এই "এক পরিবারের" ভাব প্রথম বয়সেই কিরূপ সুন্দর আকারে তাঁহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ;—

"আমাদের যে একটী আশা আছে যে, সমুদয় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা বৃথা হইবার নহে। সময় ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের রাজ্যে দুই পরিবার কখনওই থাকিবে না, সকল পরিবারই এক হইবে। অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল।"

—১১ই মাঘ, ১৮৬২ইং

(ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ মাঘোৎসব উপলক্ষে)

(৪) শ্রীকেশব সংসারে "real brotherhood" স্থাপনের ইচ্ছা ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাই "sectarianism" তাঁহাকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর যখন **এক** এবং তাঁহার সন্তানগণকে নিয়া পরিবারও যখন **এক**, তখন ধর্ম্মও এক না হইয়া পারে না। এখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ অসম্ভব। অতএব ইহা একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে উপরোক্ত সাংবৎসরিক উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে তিনি যে উপদেশ দান করেন তাহার এক স্থানে মহা তেজের সহিত বলিবেন,—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে।"

গ। যে নবযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীকেশব ভগবানের বিশেষ আদেশে পৃথিবীতে আগমন করেন, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাহার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে ১৩ খানা পুস্তিকা উপর্য্যুপরি প্রকাশ করেন; বলা বাহুল্য যে ধর্ম্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহাদের মূল্য অত্যন্ত বেশী। মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র তাঁহার "Life of Keshub Chandra Sen" গ্রন্থে এই সকল প্রবন্ধ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

নবযুগ ধর্ম্মের আরম্ভিক প্রচার

"These tracts give a very complete view of the elementary principles and beliefs, upon which it pleased Providence to rear the noble structure of Keshub Chandra Sen's religious character......Have not these utterances, made more than quarter of a century ago, the mystic ring of Keshub's latest teaching? The development is systematic, there is a singular likeness between the first and last stages. The reader ought to remember that there was no antecedent Brahmo literature from which a single atom of the sentiments or expressions quoted conld be borrowed. Keshub created that literature, and it was thus he laid down the first rudiments."

গ। অদ্ভুত বণিক।

ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে শ্রীকেশব যৌবনে পড়িতে না পড়িতেই তাঁহার পরম পিতার আদেশে নববিধানের মূল সত্য-ধন বক্ষে করিয়া বণিকবেশে ঘরের বাহির হইলেন এবং নগদ মূল্যে "বেচাকেনা" করিতে করিতে ভগবানেরই লীলা-কৌশলে এক নূতন মেলায় আসিয়া দেখা দিলেন, যাহার নাম "ব্রাহ্মসমাজ।" তিনি নিজে এই বাণিজ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোলা হয়, তখনই এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ঋণ করিয়া কিছু ক্রয় করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিক্রয় হইবে না ; যেরূপ সঙ্গতি ও সম্বল, তদনুসারে ক্রয় করা ও নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা প্রথমাবধি নিয়ম ছিল।......যখন যতটুকু পাইয়াছি, যতটুকু প্রেমরস ঘটে ছিল, যতটুকু বিদ্যা ছিল, যেটুকু মানিতাম, সেই টুকুই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। এইরূপ অনেক বুঝিয়া বাণিজ্য চালাইতে হইয়াছিল, ক্রমেই কারবার বাড়িল, অনেকে কিনিতে আসিলেন। এই টুকু নিয়মের জন্যই কারবারের এত শ্রীবৃদ্ধি হইল।"— জীবনবেদ।

শ্রীকেশব প্রকৃতই এক অভিনব শ্রেণীর বণিক। একদিকে পৃথিবীর বড় বড় মহাজন, অন্যদিকে পথের ভিখারী, সকলের সঙ্গেই তিনি নগদ মূল্যে কারবার চালাইতেন ; লোকসান

তাঁহার কোনদিনই হয় নাই, শুধু লাভই হইয়াছে। কিন্তু যত তাঁহার উপার্জ্জন সমস্তই বিশ্বপদে সমর্পণ। ভাণ্ডার তবুও খালি হয়না, ক্রমাগতই মূলধনের বৃদ্ধি! এই জন্যই তিনি জগৎকে শুনাইলেন,—

"যেখানে বলিয়াছি অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকি থাকে, সেখানেই জিতিয়াছি।"—জীবন বেদ।

ঘ। জন্ম-শিষ্য ও জন্ম-আচার্য্য

সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে এই বলিতে হয় যে শ্রীকেশব একাধারে জন্ম-শিষ্য ও জন্ম-আচার্য্য। নিজে শিখিয়া অপরকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। এক দিকে এই বিশাল বিশ্বের নানা ভাণ্ডার হইতে প্রত্যাদেশ যোগে নিত্য নূতন জ্ঞান-রত্ন লাভ, অন্য দিকে তাহা সংসারের দুঃখদারিদ্র্য দূর করার জন্য বিতরণ,— ইহাই তাঁহার জীবনের কার্য্য। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট এই পবিত্র কার্য্য করিতে করিতেই তিনি সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই অমৃত-ধামে তিনি যে এখনও এই মহাব্রত সাধনে নিরত নহেন তাহা কে বলিবে?

শ্রীকেশব যে জন্ম-শিষ্য তাহা তিনি নিজেই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"শিখধর্ম্মের প্রধানধর্ম্ম শিক্ষা করা আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই ভাব হইতেই জীবন-তরু দিন দিন সবল ও সতেজ হইতেছে।......প্রাণীমাত্রই আমার গুরু, বস্তুমাত্রই আমার শিক্ষক; মনুষ্যপ্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি। চক্ষু খুলিলে বিদ্যালয় দেখিতে পাই, চক্ষু বন্ধ করিলে আরও প্রকাণ্ড বিদ্যালয়।......

"শিক্ষাই আমার ব্যবসায়, শিক্ষাতেই জীবন, সুখ শিক্ষাতে, পরিত্রাণ শিক্ষাতে। শিক্ষা করিয়া এত সত্যধন পাইয়াছি, বলিয়া শেষ করা যায় না।"— জীবনবেদ।

তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে আবার **জন্ম-আচার্য্য**, এবং মানব-জাতিকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া মুক্তির সরল সহজ রাজপথ দেখাইয়া দেওয়ার জন্যই যে তাঁহার পৃথিবীতে আগমন, তাহা তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত বাণী হইতে নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যায়,—

"I am called to awaken the world, and from my early boyhood before I joined any church or any community, I tried to awaken men. I had neither any congregation nor any followers then; so I addressed the passers-by. without name, without method I spoke to those who walked through the streets, and they heeded me not. Then when I got a handful of boys to listen to me I tried to awaken them with all

my might. Then when I had an audience I spoke with still greater zeal. Next I began to preach, and the shopkeepers and the common people, as well as the wise and educated, were the objects of my ministry. And now when almost the whole world has heard my voice, in city-squares and riversides I try to awaken vast crowds who come to hear me. I will continue to call and awaken as long as my voice is left to me."—The Apostle's Calling.

এই একাধারে শিষ্য-প্রকৃতি ও আচার্য্য-প্রকৃতি নিয়াই অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক শ্রীকেশব বিধাতার আদেশে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রবেশ মাত্রই নেতা ও উপদেষ্টা রূপে গৃহীত হইলেন। ব্রহ্মবাণী অনুসরণ করিয়া তিনি যে দিকে চলিলেন সমস্ত ব্রাহ্মসমাজও সেই দিকেই চলিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্র প্রত্যেক উদীয়মান ব্রাহ্মের নিকটে উন্নতির বিধি হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীতে প্রকৃত বিশ্বাসের অভিনব অভিনয় প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইল; ইহা যে কি অলৌকিক ব্যাপার তাহা মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র এই ভাবে তাঁহার "Life of Keshub Chandra Sen" গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন,—

"When he [Keshub Chandra Sen] entered it [the Brahmo Somaj] he found in it a few

elementary particles of uncertain deism, he left it a most highly-organised religion, with far-reaching doctrines, with a catholic culture that embraces the discoveries and developments of every faith and communion. He found it a barren rock which scarcely yielded to any one the living water of spiritual life, and upon which no practical reform of any kind could grow. He left it a great fruitful field, producing social reforms without number, the golden harvests of the intellect, of unsurpassed devotions, and mature religious character. He found it an abode of dry rationalism, nearly devoid of all personal religion. He left it full of every form of faith and spirituality, full of devoted men and women ready to die for their faith. When he entered the Brahmo Somaj, all that it possessed in the shape of scriptures was a fragment of Vedantic teaching. He left to it the legacy of the scriptures of all nations. He found in it the absence of any personal centre—an absence of prophets and holy examples that hold mankind together. He left it a populous pantheon in which the holy and good of all religions are congregated. ....The fame

যাদুকরের যাদু-খেলা

of the Brahmo Somaj now rings nearly all through Asia, Europe and America. He found the Brahmo Somaj a frail human organisation; he left it a great Divine Dispensation, whose future involves the spiritual future of mankind."

প্রতাপচন্দ্রের এই বিবৃতি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য কেশব-জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীকেশব ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ।

(মণি কাঞ্চন যোগ)

শ্রীকেশব যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন ব্রাহ্মসমাজপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন হিমালয়ে স্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে বিখ্যাত সেন-পরিবারের একটী যুবক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না; শ্রীকেশবকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য ভোজনের আয়োজন

হইল। ঋষি গৌরগোবিন্দ তাঁহার "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকার জন্য পিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিবেন স্থির হইলে, সেখানে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইল। যথাসময় তিনি উপস্থিত হইলে সুমধুর বিবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গের পর ভোজনস্থলে নীত হইলেন।

ঋষি গৌরগোবিন্দের সাক্ষ্য

সেখানে গিয়া দেখেন, সমুদয় ভোজনসামগ্রী একেবারে তাঁহার গ্রহণের অযোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিবিধ প্রকারের মাংসের আয়োজন। তিনি ভোজ্য সামগ্রী হইতে হস্তোত্তোলন করিলে পিতা দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চমকিত হইলেন। একজন হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবক মাংসাহারে বিমুখ, ইহা তাঁহার নিকট অতি নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। তিনি নব্য যুবকদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, মাংসের সঙ্গে সুরার বা প্রয়োজন হয় এজন্য ঠাকুর বংশের নিমন্ত্রিতগণের সেবার রীত্যনুসারে, তাহারও আয়োজন রাখা হইয়াছিল। মাংসাহার-বিমুখ যুবাকে লইয়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, তখনতখনই কিঞ্চিৎ ভাজির আয়োজন করিয়া তাঁহাকে রুটির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যথেষ্ট মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেশবচন্দ্র একাই

তাঁহাদিগের দলবহির্ভূত হইয়া রহিলেন। প্রথম সমাগমের এই ব্যাপার তখন কিঞ্চিৎ অসুখ উৎপাদন করিলেও, উহা পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের সৌহৃদ্যবন্ধন সুদৃঢ় করিবার কারণ হইল। কেননা চরিত্রজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ নবীন যুবার বৈরাগ্যপ্রণোদিত চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি সমধিক সমাকৃষ্ট হইলেন।"

মহর্ষির সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মধুর আত্মিক সম্বন্ধ এই প্রথম আলাপ পরিচয় হইতে আরম্ভ হয়। এই মিলন ধর্ম্ম জগতে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। "প্রেমদাস" ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার "কেশব চরিত" গ্রন্থে এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথের সাক্ষ্য

"এই মিলন পৃথিবীর ধর্ম্মসংস্কারের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রথম মিলনকালে ইহারা উভয় উভয়কে কি যে এক শুভ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহার ভাব আমরা কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, কিন্তু বর্ণন করিতে পারি না। বৃদ্ধ অদ্বৈতের সঙ্গে যুবক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম সাক্ষাতের কথা এখানে মনে পড়ে। দুই জনের গূঢ় ধর্ম্মপ্রকৃতি নীরবে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়াছিল।"

মহর্ষির সহিত শ্রীকেশবের ধর্ম্মসম্বন্ধ কিরূপ সুমিষ্ট ও সুখদায়ক ছিল তাহা শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি-লিপিতে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের সহিত যুবা কেশবচন্দ্রের যেরূপ সুমিষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে, বন্ধু বন্ধুতে এবং গুরু ও শিষ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সে সমস্ত সম্বন্ধেরই সমষ্টি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে মহর্ষি আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেন, কেশবচন্দ্র অন্যান্য লোকের সহিত সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক আপন কোচের উপর নিজ পার্শ্বে বলপূর্ব্বক এই বলিয়া বসাইতেন যে, 'তোমার এই স্থান'। যখন মাখম মিছিরী বা অন্য কোন খাদ্য মহর্ষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া এক চামচ ব্রহ্মানন্দের মুখে ও অপর চামচ নিজ মুখে প্রদান করিতেন যে 'একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই।' এক একবার কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া মহর্ষি অনিবার অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ যে সকল উপদেশ দান করেন, সেই সকল উপদেশ কালে কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার ভাবোদ্দীপন হইত, এবং এই কারণেই কেশবচন্দ্রকে বেদীর সম্মুখে বসিতে হইত। আমরা অনেক প্রকার ধর্ম্মবন্ধুতার বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু

ভাই মহেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য

কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বোধহয় আর কোথাও ছিল না।"

মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র তাঁহার "Life of Keshub Chandra Sen" গ্রন্থে এই সম্পর্কে যে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্য

"Who that had a stake in the Brahmo Somaj could ever forget the singular relations of spiritual friendship that had slowly and unconsciously grown up between two men so differently constituted as Keshub Chandra Sen and Devendranath Tagore! In Keshub, as Devendranath subsequently expressed, he had found 'the wealth of seven empires', he had found a genuine man of God, a friend of 'undivided spirit.' Many men had he seen, he had converted many idolaters into theists, but he had never yet met a man whose only delight lay in God. He therefore gave Keshub the surname of Brahmananda (Rejoicer in God), Keshub on the otherhand fonud in him an affectionate response, a maturity of faith and love, which he had never met before. ......In Devendra's prophetic eye Keshub centred in

himself the whole hope and promise of the future Brahmo Somaj, the ideal spirituality of the rising generation, the gifts and blessings of Providence to the land. Everything he did or said carried a good omen to Devendra's fatherly heart ; every feature of his face and mind was a gleam of the Life Eternal to his imaginative trusting soul. Keshub's enthusiasm filled him with the electricity of the higher spheres, Keshub's sympathy intoxicated him, Keshub's intelligence deepened and confirmed his own wisdom, he found a perfect marvel of religious genius in Keshub Chandra Sen. ...They sat together face to face, absorbed in the ecstasy of transcendent spiritual intercourse, drunk with mutual sympathy and communion...... How distinctly does the present writer remember the glowing incident wherein Devendranath one day indicated Keshub's future. 'When Rajah Duswanta (husband of the discarded Sakuntala) had occasion to go up to Heaven, he saw, outside the great portals, a little boy playing with a young lion whose teeth he insisted upon forcing open, that he might count them. The Rajah thought—if such be the power of that little fellow when he is a child, what will he become

when he grows up to be a man ?—Rajah Duswanta did not recognise that the brave child was his own son, born of the banished Sakuntala'. 'Brahmanada', said Devendranath, is but a youth. If such be his power now, what will it be when he fully grows up ?' Alas ! that when Keshub did grow up to the full height of his manhood, Devendranath could not be at hand to give him the fond fatherly recognition."

এই অভূতপূর্ব্ব আত্মিক প্রীতি-বন্ধন চিরদিনই অটুট ছিল। সংসারের "দশচক্র" এবং ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্পর্কীয় মতের অনৈক্য কখনও কখনও বাহিরে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের মূলে যে স্বর্গের যোগ স্থিতি করিতেছিল কোন দিন কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। শ্রীকেশব যে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সংসারের অতীত বিশ্বাস-রাজ্যে স্থিতি করিয়া ভয়ঙ্কর পরীক্ষার ভিতরেও নির্ব্বিকার চিত্তে উদার ভাবে তাঁহার "ধর্ম্মপিতার" সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা বজায় রাখিয়াছিলেন তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে : এখন প্রমাণ স্বরূপ কেবল দুখানা পত্র (যাহা শ্রীকেশবের মহাপ্রস্থানের কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল) এখানে প্রকাশ করিতেছি।

অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধন

১৮৮২ খৃস্টাব্দে শ্রীকেশব হিমালয়পর্ব্বত হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন,— "হিমালয় দারজিলিং,

৭ জুলাই, ১৮৮২।

"ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? এই নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়! হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন।

ব্রহ্মানন্দের পত্র

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই পত্র পাইয়াই মসূরী পর্ব্বত হইতে এইভাবে উত্তর দান করিয়াছিলেন,—

"আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ, ৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শীরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারি পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র

"আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ আফ্শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

'কাহাকেও এমন পাইনা যে আমার কথায় সায় দেয়।'

"তোমাকে সে পাগ্লা যদি পাইত, তবে তাঁহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্‌ত আর খুসি হয়ে বলতে থাকিত,—

'কিমস্তি জানিনা যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।'

"তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি, এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা

ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। 'তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা'; সেখানে পিতা অপিতা হন্, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি— ২রা শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
মসূরী পর্ব্বত।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে (১৪ আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্রীকেশবকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"তাঁহার [আনন্দময়ের] প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য!

মহর্ষির শেষ পত্র

তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দজনন সুন্দর আনন দেখরে নয়ন সদা দেখরে।"

শ্রীকেশবের নিকট মহর্ষির এই শেষ পত্র। মহর্ষি তখন

জানিতেন না যে আর মাত্র ২ মাস ২৭ দিন পরেই তাঁহার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ ভগবানের আহ্বানে অমৃতালয়ে চলিয়া যাইবেন!

পঞ্চম অধ্যায়।

বিশ্বাস-বিজয়।

"কর বজ্রদেহী অমর অভয়,
অটল হৃদয় বিশ্বাস-বিজয়।"

আমি তৃতীয় অধ্যায়ের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীকেশব মহাগুরু ভগবানের নিকটে নবযুগধর্ম্মের আদি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রার্থনা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন সেই মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মসমাজপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই কি এক অজ্ঞাত যাদুমন্ত্রের প্রভাবে তাঁহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিলেন। মহর্ষি হইলেন ধর্ম্মপিতা, এবং সমাজের অন্য সকলে হইলেন প্রিয় ভাই

ভগিনী। মহর্ষি বলিলেন, "তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, আমি তোমার উপরই সমাজ পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলাম।" ব্রাহ্মসাধারণ বলিলেন, "আপনি আমাদের যোগ্য ভাই, আপনাকে নেতা বলিয়া আমরা বরণ করিলাম।" বাস্তবিকই তিনি অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই অভিষেক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পর অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

ক। ভক্তের জয় নিঃসংশয়।

শ্রীকেশব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার আচার্য্য হইলেন। এই ৫ বৎসরে তিনি কি অসাধ্যসাধন করিয়া সকলের মন প্রাণ অধিকার করিলেন তাহার এক চিত্তগ্রাহী বর্ণনা মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র "Life of Keshub Chandra Sen" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

"During these five years he developed into a lecturer, tract-writer, reformer, missionary,

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত কর্ম্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত

and philanthropist. The activities of his moral and religious nature developed steadily. He became the apostle of every manner of enlightened public spirit, of continued reconstructive social progress. These improvements he added to his foregone attainments of ascetic moral rigour, high piercing intelligence, burning restless enthusiasm. His spiritual character was still in the course of organic formation. The faith, the prayerfulness, the soaring impulses of inspiration, the humilities, the tender penitences were all there but undeveloped, in a state of volcanic combustion, the fierce flame of which formed a sort of contagious frenzy. All who approached it, young or old, the young specially, were caught in it. A mysterious law of events, an unperceived under-ground force, call it as you may, providence, or predestination, fate, or necessity, progress, or evolution, added power to power, gift to gift in his nature. Devendranath Tagore, himself elderly, wise, cautious, much experienced in the vanity of human relations, felt the strange magnetism of the youngman's genius. The Brahmo Somaj became the resort of the finest

youth of Calcutta, and not a few well-grown elderly men competed with the young for the new standard of excellence so unexpectedly set up. Every important step Keshub took became a new departure for the whole movement. Every enterprise into which he launched opened the perspective of a new future. Like some immortal eternal seed, it always fell into fertile ground, it germinated and produced a hundredfold of its kind. It created a widely-felt vitality, opened hidden possibilities, drew men as in a fowler's net, and pervaded the atmosphere. Well does Devendranath summarise Keshub's powers. 'Whatever he thought in his mind he had the power to express in speech. Whatever he said he had the power to do. Whatever he did he had the power of making other men do.' Thus gradually Keshub's life became the law of progress for the Brahmo Somaj."

এই যে একটী "Unperceived underground force" এর কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে শ্রীকেশব অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে, অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা যে সত্য নিম্নে উদ্ধৃত কেশব-বাণী তাহার অকাট্য প্রমাণ ;—

"জন্মের পর যার জন্য ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে 'জয়লাভ' লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার জয়লাভ কে খণ্ডন করিতে পারে? দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিলাম।

জয়-পত্র

হরি সকাল বেলাই বলিলেন, 'বর লও'। ভক্ত কি বর চাহিলেন? এই বর চাহিলেন, যেন জয়ী হই। তখন নিজ হস্তে হরি লিখিয়া দিলেন, 'ভক্তের জয়, নিঃসংশয়'। এখন দেখিতেছি ভক্তির সহিত যা করা যায়, তারই জয় হয়। এ সময় আশ্চর্য্য প্রমাণস্থল এত হইতেছে, যে আর গণনা করিতে পারি না।" —জীবনবেদ।

ব্রহ্মকৃপার কি আশ্চর্য্য প্রকাশ! বিশেষ করুণা আর কাহাকে বলে? শ্রীকেশব "সকাল বেলাই" পরমেশ্বরের জয়-পত্র মস্তকে ধারণ করিয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় বিধানের পথে অগ্রসর হইতে হইতে শুধু যে ভারতকে নবধর্ম্মের নবভাবে জাগাইয়া মাতাইয়া তুলিলেন তাহা নহে, কিন্তু ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপরে স্বর্গরাজ্যের জয়-পতাকা উড়াইলেন। এই সমস্তই যে শুধু ঐশী শক্তিতে সম্পন্ন হইল তাহা তিনি স্বীকার করিয়া আবার বলিয়াছেন,—

"নিজ গুণে এত হইল না; সকলই হইল হরিপদ ধরাতে। ধূলি যদি এক মুষ্টি ধরা যায়, আবার বলিতেছি স্বর্ণমুষ্টি হয়।... সকল দিকেই কেবল মঙ্গল দেখিতেছি।

ব্রহ্মকৃপার গুণ

হরিনাম কি প্রবলই হইয়াছে! পঁচিশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। এখন যদি শত্রুসংখ্যা

বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্বলিত হয়, বিপদ আসিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি ভয় নাই। কেননা জয়ী হইবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি, কোন যুদ্ধে হারি নাই। যত মহারণে প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলাম, সর্ব্বত্রই জয় হইল।"— জীবনবেদ।

ঈশ্বরাদেশে পাপ-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সংসারে নববিশ্বাস-রাজ্য স্থাপন করা যাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য, তাঁহার চারিদিকে যে শত্রুতানল প্রজ্বলিত হইবে, এবং ভয়ঙ্কর বিপদ আপদ আসিয়া তাঁহাকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শ্রীকেশব একেবারে নির্ভয় নিশ্চিন্ত! ঐ দেখ তিনি প্রজ্বলিত সমরাগ্নির ভিতরে বিশ্বাস-দুর্গে বসিয়া ধ্যানমগ্ন-প্রাণে ব্রহ্মকৃপার জয়গান করিতেছেন!—

"কি ভয় ভাবনা রে মন ল'য়েছি যাঁর আশ্রয়,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে; দয়াল ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্য্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশাবচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে এই তাঁর অভিপ্রায়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাকরে সদা নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল জয় জয় দয়াময়।"

ইহাকেই বলে **বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষা**; এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ "যুদ্ধে জয়লাভ"। ইহা যে কি ব্যাপার তাহা আরও একটু ভাল করিয়া দেখা যাক্।

খ। বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষা।

এই সংসার পরীক্ষার আগার। মানব-জীবন বিপদে আপদে পূর্ণ। এমন কে আছে যে এই সংসারে বাস করিয়াও আপনাকে ঘোর পরীক্ষা হইতে দূরে রাখিতে পারে? পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসিবেই। ঝর তুফান মাঝে মাঝে ভীষণ বেগে বহিবেই। ভব-সিন্ধুর বিশাল তরঙ্গ গর্জ্জন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মাথার উপর পড়িবেই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা শ্রীকেশবের ন্যায় বিশ্বাস-শৈলের উপর জীবন নির্ম্মাণ করিয়া বলিতে পারেন,—

"I have found the rock of truth, and my heart rejoices in having seen the God of my salvation."—Prayers.

শ্রীকেশব বিশ্বাসাত্মা পুরুষ, বিশেষ ভাবে পরীক্ষার ভিতরে পড়া তাঁহার নিয়তি। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

তাঁহাকে নানা প্রকারের পরীক্ষা দিয়াই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত পরীক্ষার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"The progress of faith is to be gauged by its distance from the world. The more it advances the fewer its companions, the smaller the circle of sympathy, and the more inveterate the world's antagonism. Persecution is inevitable, mild at first but deadly in the end. It is the price due to the world for living above it."

True Faith.

পরীক্ষার ভিতরে পড়িয়া শ্রীকেশব কি জীবনের কোন সময়ে একটীবারও টলিয়া ছিলেন? কখনও নয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত উন্নতির পথেই নিয়া গিয়াছিল। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি এত উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া মসূরী পর্ব্বত হইতে মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, —

"ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাইনা—তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞান-তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের

ব্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদীদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"— **পত্রাবলী।**

অন্য এক সময়ে তিনি কেশবচন্দ্রকেই লিখিয়াছিলেন :—

"আমার জীবনে বঙ্গভূমিমধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ চরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই।"— **পত্রাবলী।**

শ্রীকেশবচন্দ্রের বিশ্বাস বাধাবিঘ্নের সম্মুখে পড়িয়া কি যে রুদ্র তেজে জ্বলিয়া উঠিত তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইতে একটু বুঝা যাইবে,—

"বিশ্বাসীর বিশ্বাস কেমন? অচল অটল।......যথার্থ বিশ্বাসীর সম্পদেও বিশ্বাস, বিপদেও বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস-চক্ষে দেখেন এবং যত পরীক্ষা দুঃখ বিপদ আসে তত তিনি বলেন আমার বিশ্বাস-রথের চক্র উন্নতির দিকে যাইতেছে। তিনি অটল হইয়া থাকেন, প্রাণ ছাড়িব তবু বিশ্বাস ছাড়িব না। যদি পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ড উল্টাইয়া যায় তবু বিশ্বাস ঠিক সোজা থাকিবে।......পৃথিবী আমাদের উৎপীড়ন করিবেনা কে বলিল? কিন্তু মুখের বাতাসে ফুঁদিয়া সকল উড়াইয়া দিব।"— **দৈনিক প্রার্থনা।**

বিশ্বাসের এই অমোঘ বল কোথা হইতে আসিয়া শ্রীকেশবের হৃদয়কে অজেয় করিয়া দিত তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে পরিস্কার বুঝা যায়,—

"Faith is strong in the strength of the Almighty, and hath invincible power."

True Faith

সংসারের দুঃখ কষ্ট বিশ্বাসীর কি করিবে ? তিনি যে নিয়ত কাল তাঁহার প্রভুর সঙ্গে আনন্দ-লোকে বাস করেন। ঐ শুন শ্রীকেশব কি বলিতেছেন,—

C| "Faith rejoiceth in the All-Blissful God and findeth joy immeasurable in His Service...... Though midnight gloom surrounds it it enjoyeth within meridian sunshine. With forbearance and resignation it blunteth the edge of sorrow. With hope and patience it converteth the bed of thorns into a bed of roses."— True Faith

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সহৃদয় পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা একটু নিষ্ঠার সহিত কেশবজীবন পাঠ করুন ; তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে প্রকৃত বিশ্বাসের বিমল প্রভা কি চিত্তবিমোহন ভাবে কেশবজীবনের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুখেও যেমন দুঃখেও তেমন, শত্রুর ঘোর নির্য্যাতনেও যেমন, বন্ধুর মধুর ভালবাসাতেও তেমন,—সর্ব্ব অবস্থাতেই স্বর্গের এই চিন্ময় আলো স্থির শান্তভাবে ভক্ত-প্রাণে জ্বলিতেছে !

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আচার্য্য-পদে অভিষেক ও পরীক্ষা জয়।

শ্রীকেশবের আচার্য্য-পদে অভিষেক ব্রাহ্মসমাজে একটী বিরাট ব্যাপার। ইহা যে লীলারসময় পরমেশ্বরের বিশেষ মঙ্গলাদেশেই হইয়াছিল তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে অতি পরিষ্কার ভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মহর্ষি বিশেষ কোন কারণে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত গুস্‌করা নামক গ্রামে গমন করিয়াছিলেন! প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া সাধন ভজন করিবার উদ্দেশে তিনি একটী সুরম্য আম্র-কুঞ্জে তাঁবু ফেলিয়া স্থিতি করেন। একদিন অপরাহ্নে যোগীবর একাকী ব্রহ্মচিন্তনে নিরত আছেন। চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ, শুধু বিহঙ্গ-কুলের সুমধুর কাকলী মাঝে মাঝে কোন্ অদৃশ্য রাজ্য হইতে স্বপ্ন-সঙ্গীতের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়া কাননবাসীর প্রাণকে সুধাসিক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধে লতা পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীলঘন হাসি, নিম্নে সমস্ত বনময় স্নিগ্ধ ছায়ার মৃদুল নৃত্য। মহর্ষির প্রাণ এই অতুল স্বভাব-সৌন্দর্য্যের ভিতরে মহাসমাধিতে মগ্ন! এমন সময়ে অকস্মাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জীবন্ত আদেশবাণী

চিদাকাশ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল,—

"কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বরণ কর;

ঈশ্বরের আদেশ-বাণী

সমাজ সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইবে।"

মহর্ষি ঈশ্বরের এই আদেশ শীরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মগণের নিষেধ সত্ত্বেও নববর্ষের প্রথম দিনে (১লা বৈশাখ) শ্রীকেশবকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া মহা সমারোহে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। সত্যের জয় হইল, এবং মানবজাতি সম্পর্কে বিধাতার মঙ্গল-বিধি পূর্ণ হইতে চলিল।

ক। স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বারোদ্‌ঘাটন।

উপরোক্ত ১লা বৈশাখ প্রভাতে শ্রীকেশব আপনার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে নিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করেন। এই জন্য সেন-পরিবারে যে কি মহাহুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অনেকে জীবন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি এখানে ঋষি গৌরগোবিন্দের সাক্ষ্য প্রকাশ করিলাম।—

"১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে প্রধানাচার্য্যের গৃহে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইবেন, মাতার নিকটে অগ্রে বলিয়াছিলেন। গৃহে এ কথা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে সেন-পরিবারের কুলবধূ ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইবেন, এইরূপ হইতে দেওয়া পরিবারের সকলের পক্ষে অবিষহ্য হইয়া উঠিল। যাহাতে কেশবচন্দ্র তাহার পত্নীকে লইয়া যাইতে না পারেন, এ সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্‌যোগ হইল। কেশবচন্দ্র প্রত্যূষে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরের চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী লজ্জাসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছিলেন। গৃহের কুলবধূ কোন দিন বাহিরে গমন করেন নাই, বাহিরের চত্বর লোকে পূর্ণ, ভাশুর প্রভৃতি গুরুজন দণ্ডায়মান, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং এ কার্য্য লজ্জাশীলা কুলবধূগণের উচিত নয়, বলিয়া ধিক্কার দিতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হওয়া কিছু আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তিনি পশ্চাতে একটু অপসৃত হইলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'যদি আমার অনুবর্ত্তিনী হইতে চাও, এই বেলা অনুবর্ত্তিনী হও; এই সময়। অন্যথা আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।' সত্যবাক্ স্বামীর ঈদৃশ শাসনবাক্য তিনি অগ্রাহ্য

করিতে পারিলেন না, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা করিবেনই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি অনুনয় বাক্যে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া না হয়, কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে কে বিরত করে? সে সময়ে তাঁহার দেহ-মনঃপ্রাণ তেজে পরিপূর্ণ; তিনি সপ্রতিজ্ঞ ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পত্নী সহকারে অবরুদ্ধ দ্বারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র এখনও ক্ষীণকায়, কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষীণ দেহে এমন প্রভূত বলসঞ্চার হইয়াছিল—এ অদ্ভুত বলসঞ্চারের কথা আমরা তাহার নিজ মুখে শুনিয়াছি—যে অর্গলে হস্তার্পণ করিলে উহা অনায়াসে উৎপাটিত হইয়া আইসে।......যাহা হউক কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবলে সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া পত্নীকে লইয়া প্রধানাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন।"— আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

নারী-জাগরণের আদি কারণ

এই যে শ্রীকেশব ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ হিন্দুসমাজের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সহধর্ম্মিণীকে লইয়া অর্গলবদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে "পীরালী" পরিবারে গমন করিলেন ইহা হইতেই বঙ্গদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ চিরতরে উন্মুক্ত হইয়াছে। আজ কাল স্ত্রী-স্বাধীনতার মহা আন্দোলন সমস্ত দেশকে

জাগাইয়া তুলিয়াছে; নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এখন কতই নারী-সমিতি ও নারীসঙ্ঘ মহা উৎসাহের সহিত নানাভাবে কার্য্য করিতেছে। এই মহাজাগরণের আদি কারণ যে শ্রীকেশব তাহাতে কি বিন্দু মাত্রও সন্দেহ আছে?

খ। পৈত্রিক গৃহ হইতে নির্ব্বাসন।

উপরে বর্ণিত ঘটনা শ্রীকেশবকে এক বিষম পরীক্ষার ভিতরে ফেলিল। অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশ্যভাবে "পীরালী" পরিবারে গমন এবং "খৃষ্টানী" ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান হিন্দুসমাজের বিচারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। ইহার দণ্ড হইল পৈত্রিক গৃহ হইতে সস্ত্রীক শ্রীকেশবের নির্ব্বাসন। কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দমিলেন না, তাঁহার হৃদিস্থিত বিশ্বাস মহাতেজের সহিত উত্থান করিয়া সিংহ-বিক্রমে দেশের অনাচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

পরিবার হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার পরে (২১শে বৈশাখ, ১৭৮৫ শক) শ্রীকেশবচন্দ্র বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"নববর্ষের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম; ইহাতে

বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন, এবং নানাপ্রকার উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, ইহা স্মরণ করিয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়াছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাটী হইতে একখানা পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা ছিল—তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া অন্যত্র বাসা করিবে। সেই দিন হইতে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি।...যতদিন না স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি ততদিন হয়তো এস্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।

"ত্যাগ স্বীকারের কাল উপস্থিত"

দেখি কি হয়। সত্যের জয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। চতুর্দ্দিকে গোলমাল হইতেছে। শুভচিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; ত্যাগ স্বীকারের কাল উপস্থিত। বিষয় ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ, কত ত্যাগ ব্রাহ্মদিগের করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান হইয়াছে। এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য, মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত হইবে।"

যৌবনের আরম্ভে যদি তিনি এইরূপ বিশ্বাসের বল দেখাইতে না পারিতেন তবে কি আর পরবর্ত্তী সময়ে নববিধানের শুভাগমন সম্ভব হইত?

উপরোক্ত পত্রে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে "আচার্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহর্ষি প্রথমতঃ তাই ছিলেন; কিন্তু শ্রীকেশব যখন আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে "প্রধান আচার্য্য" রূপে গ্রহণ করিল।

গ। রোগ-শয্যা।

"আমি দরিদ্র, যন্ত্রণা আমার খাদ্য, চিন্তা আমার বিশ্রাম, শরশয্যায় আমার শয়ন। আমি ত্যাগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি। অতএব আমার নিজের জীবনে উহার প্রমাণ না প্রদর্শন করিতে পারিলে আমার জীবন বৃথা, আমার ধর্ম্ম কপটতা।"—বিশ্বাসাত্মা পুরুষ শ্রীকেশবের এই বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা নানা প্রকারেই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

তিনি ধর্ম্মের জন্য পৈত্রিক গৃহ হইতে কি ভাবে নির্ব্বাসিত হইলেন তাহার আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সংবাদ শুনিয়াই সাদরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।" তাহাই হইল। শ্রীকেশব নির্ব্বাসন-দুঃখ ভুলিয়া সস্ত্রীক মহর্ষির গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষির বিদুষী কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশববাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী আসিয়া

কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেদিন যোড়াসাকো-ভবনে একটী পর্ব্বোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। যেন বহু পুরাতন আত্মীয়ের সহিত সেদিন আমাদের পুনর্মিলন ঘটিল।

"কেশব বাবুর স্ত্রীর ভারী একটী অমায়িক মধুর মুখশ্রী ছিল। আমি যদিও তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাঁহার সেই রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বদা তাঁহার কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন, আমি চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি-আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলে তাঁহার হাত ধরিয়া আবোল তাবোল কত কি বকিয়া যাইতাম। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেছেন কিনা তাহা বুঝিবার শক্তি তখনো আমার জন্মায় নাই। কেশব বাবুকে দাদারা ব্রহ্মানন্দ বলিতেন। তিনিও ছেলেদের চিত্তরঞ্জনে খুব পটু ছিলেন। তাঁহাকেও আমরা সকলে খুব ভালবাসিতাম। তিনি বেশ গল্প করিতে পারিতেন। দেখা হইলেই আমরা গল্পের জন্য তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম। তাঁরও গল্পের ভাণ্ডার কখনো ফুরাইত না।"—সাহিত্য-স্রোত।

কিন্তু এই নির্ব্বাসনেই শ্রীকেশবের বর্ত্তমান পরীক্ষা শেষ হইল না। তিনি এক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার উরুদেশে একটী নালীরন্ধ্র হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। সুপ্রসিদ্ধ গুডিপ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ওয়েব প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। একবার

শস্ত্রচ্ছেদে প্রতীকার না হওয়ায়, তার পর পাঁচছয় বার শস্ত্রচ্ছেদ করিতে হয়। কোন বারেই তিনি ক্লেশানুভবের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। চিকিৎসকগণ এই রূপ অসামান্য ধীরতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হন।

তাঁহার এই রোগের সংবাদ পাইয়া মাতা সারদা দেবী তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন; অথচ এইরূপ ব্যস্ততা সত্বেও তাঁহার পৈত্রিক গৃহে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না; সুতরাং একটী ভাড়াটিয়া গৃহে তাঁহাকে সস্ত্রীক লইয়া যাওয়া স্থির হইল। শ্রীকেশব এই সামান্য বাড়ীতে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। মাতা সারদা দেবী সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং ডাক্তার নীলমাধব হালদার নিয়ত তাঁহাকে দেখিতেন। একজন "নাপিত" ডাক্তারও (শ্রীকেশবের একজন শিষ্যের পিতা) মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ নিতেন; চিকিৎসায় কোন প্রকার উপকার হইতেছে না দেখিয়া এই অজ্ঞ চিকিৎসক বলিলেন, তিনি এমন ভাল ঔষধ জানেন যাহাতে অচিরে ক্ষত স্থান ভাল হইয়া যাইবে। শ্রীকেশব ইহাতে সম্মত হওয়াতে ক্ষত স্থানে নূতন ঔষধ দেওয়া হইল। প্রথম দিনে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। পর দিবস সেই অদ্ভুত চিকিৎসক এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে এই যন্ত্রণা তো কিছুই নয়, তিনিতো স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, তাহার অন্যান্য রোগীরা যন্ত্রণায় পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে আবার সেই ঔষধ দেওয়া

হইল। ইহার ফলে শ্রীকেশবের গৌরবর্ণ দেহ দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, সমুদয় অঙ্গ হিম হইয়া আসিল। ক্রমে দেহ অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। এত যন্ত্রণা তবু তিনি এমন স্থিরধীর ভাবে ছিলেন যেন তাঁহার বিন্দুমাত্র কষ্টও হয় নাই। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এইরূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাসত্ত্বেও কেন নীরব ছিলেন, তাহার উত্তর তিনি এই দিলেন যে, কি জানি বা তিনি যন্ত্রণা প্রকাশ করিলে তাঁহার মাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন! এক দিন দুই জন পণ্ডিত শ্রীকেশবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া বসিয়া পড়েন, এক জনের মাথা ঘুরিয়া যায়!

বার বার সস্ত্রচ্ছেদসত্ত্বেও ক্ষতস্থান ভাল হইতেছে না দেখিয়া অনেকের মনে আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল। এক দিন ডাক্তার নীলমাধব হালদার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি রোগীর আত্মীয়গণকে বলিলেন যে অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্ত্রের দ্বারা উৎপাটিত করিতে হইবে, ক্লোরফরম্ না করিলে কোন মতেই চলিবে না। বিশ্বাসের অবতার শ্রীকেশবচন্দ্র এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন,—"ক্লোরফরমের আবশ্যক কি?" তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কাজ করা হইল। সস্ত্রচ্ছেদের সময়ে ব্রহ্মানন্দদেব এমনই স্থির অটল ভাবে নীরবে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিলেন যে যাঁহারা তাঁহাকে তখন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া-

ছিলেন তাঁহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন যে শ্রীকেশবের আত্মা তখন জড়-জগতের অতীত ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়া শান্তি-সুধা পান করিতেছে!

যিনি বিশ্বাসবলে মৃত্যুকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন খুবই স্বাভাবিক। ব্রহ্মগতপ্রাণ যিনি, সংসারের বিপদ পরীক্ষা তাঁহার কি করিতে পারে? ঐ শুন তিনি কি বলিতেছেন,—

"With hope and patience faith converteth the bed of thorns into a bed of roses."—"True Faith."

ঘ। জয়লাভ।

শ্রীকেশব এত দিন যে ঘোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিতে-ছিলেন এখন তাহার অবসান হইল; বিশ্বাস জয়লাভ করিল। তিনি গুরুতর রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন; তাঁহার যে সম্পত্তি জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের হস্তগত হইয়াছিল তাহা পুনরায় তাঁহার দখলে আসিল, এবং তিনি পৈত্রিক গৃহে মুক্তমনে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।

যে ধর্ম্মের জন্য তিনি গৃহ হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছিলেন যাহাতে সেই ধর্ম্মের জয় সেই গৃহে ঘোষিত হয় তাহার জন্য

ব্যস্ত হইলেন। নিজের গৃহে নিজের বিশ্বাসমত পুত্রের জাতকর্ম্ম করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। জেষ্ঠতাত হরিমোহন প্রভৃত ক্ষমতাশালী; তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, পুত্রের জাতকর্ম্ম করিতে হইলে বাগানবাড়ীতে গিয়া করা হউক। শ্রীকেশব ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, পুত্রের জাতকর্ম্ম গৃহধর্ম্ম, গৃহ থাকিতে তিনি কেন উদ্যানে গিয়া উহার অনুষ্ঠান করিবেন? তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকটে জ্যেষ্ঠতাতকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনিই গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে যাইবেন, স্থির হইল; যে দিবস জাতকর্ম্ম হইবার কথা তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তিনি নিজপরিবারস্থ সকলকে বাগানবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পর দিবস প্রভাতে জয়ঢক্কা গভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠতাত অস্থির হইয়া পড়িলেন; তিনি উপরিতল হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ সাহেব রসন-চৌকিদার, জরা ঠহরহ, জরা ঠহরহ।" তিনি অনতিবিলম্বে গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন!

যে গৃহ-ভূমিতে সেনপরিবারের সর্ব্বদা কার্য্যানুষ্ঠান হইত তাহা নানা বর্ণের পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত মনোহর উপাসনা-মণ্ডপে পরিণত হইল। দলে দলে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া সভাস্থল পূর্ণ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল প্রকারের আয়োজন সঙ্গে লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। মহা সমারোহে জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। বিশ্বাসের জয় আর কাহাকে বলে?

৬। নববিশ্বাসবিজ্ঞান।

শ্রীকেশব অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর হইতে বাহির হইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ব্রহ্মকৃপালোকস্পর্শে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কি যে দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল "True Faith" তাহার সাক্ষী। এই পুস্তক গ্রন্থহিসাবে সামান্য একখানি tract মাত্র, কিন্তু "ধর্ম্মশাস্ত্রের" হিসাবে ইহা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি উপরোক্ত সনের অক্টোবর মাসে যখন নৌকাযোগে পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন এই "নববিশ্বাসবিজ্ঞান" প্রত্যাদেশের বিমল আলোকে তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হয়। এই স্বর্গীয় ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র, প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাধুগণ চিত্তহারী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র তাঁহার "Life of Keshub Chandra Sen" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Towards the end of the same year (1866) Keshub made a memorable tour through the provinces of East Bengal visiting Faridpur, Dacca and Mymensingh. The population of this part of the country, always touchable and susceptible, was thrown into a state of great agitation by

his missionary labours......In this expedition to East Bengal, Keshub's nature, after his great lectures, and in the midst of his trials, was fired with mystic faith and devouring enthusiasm. He had to suffer great privations. These sufferings which did not cause the least abatement of his zeal and energy, shook his health. He had fearful attacks of fever. ......In the midst of these drawbacks, while travelling in the inconvenient slow countryboat he composed his tract on 'True Faith', one of the master-pieces he ever wrote. Keshub had always been a man of faith. But this little treatise proves the frenzy to which this faith had risen even at that early age. Everyone ought to read 'True Faith' to get a real insight into Keshub's religious constitution......This little tract on 'True Faith' was written as a guide to Brahmo Missionaries, and Miss Collet, afterwards the implacable enemy of Keshub's new ideals,remarks that 'it resembles the mediaeval mystics on its beatific vision of God, and in the sharp contrast drawn between the life of faith, and the life of the world'. How very little prepared Miss Collet was for the development of this mysticism, and for the practical realisation of the 'contrast between the

life of faith and the life of the world !' But Keshub's singularity was that he never laid down anything in doctrine which he did not practically attempt to carry out in his own life and that of his church."

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার "কেশব চরিতে" এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"প্রকৃত বিশ্বাস". (True Faith) নামক অদ্বিতীয় পুস্তক এই সময়ের রচনা। পথে নৌকায় যাইতে যাইতে ইহা লিখিয়াছিলেন। সে আজ কত দিনের কথা! কিন্তু তখনই তাঁহার বিশ্বাস বৈরাগ্য আত্মার কোন্ গভীর স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা এক্ষণে আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইয়া যেমন পশ্চিম গগনকে আলোকিত করে, প্রকৃত বিশ্বাস তেমনি পূর্ব্ব বাঙ্গলার নদীবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে সভ্য ইয়োরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্যোতি বিস্তার করিয়াছে। ইহা বিলাতে পুনর্ম্মুদ্রিত এবং ভাষান্তরিত হইয়া তদ্দেশীয় ধর্ম্মাত্মাগণকে বিশ্বাসের শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে।"

এই স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস মঙ্গলময় বিধাতার বিশেষ নির্দ্দেশে কি ভাবে শ্রীকেশবকে জীবনের আরম্ভ হইতেই আলো—আঁধারের ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশের সটান প্রবাহে ভাসাইতে ভাসাইতে নববিধানের মহাপ্রেমসাগরে নিয়া

ফেলিয়াছিল, যেখানে নিখিল মানবমণ্ডলী একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরে মিলিত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান, তাহার সামান্য একটু আভাস মৎপ্রণীত "শ্রীকেশব-সমাগমের" ৫ম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা সাধকের পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত কেশব-জীবন অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন যে ইহা সত্যই "প্রকৃত বিশ্বাসের" সংহত আদর্শ মূর্ত্তি।

সপ্তম অধ্যায়।

বিশ্বাসের পথ স্বতন্ত্র, গতি অনন্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকেশব লীলারসময় শ্রীহরির বিশেষ মঙ্গলাদেশে নবযুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত। তাঁহার বিশ্বাস সংসারের দৃষ্টিতে একেবারে অভিনব। ইহার পথ স্বতন্ত্র, গতি অনন্ত। অতীন্দ্রিয় অনন্তলোকে ইহার স্থিতি ও বিকাশ-ভূমি, এবং অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম ইহার একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য। বিশ্বাসাত্মা পুরুষের সাধ্য কি যে তিনি নিজের অথবা অন্য

কাহারও ইচ্ছামত সংসারের সাধারণ পথে চলিবেন, কিম্বা গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইবেন? তাঁহার জীবন-নদী অনন্তের টানে অনন্তের পানে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া নিরন্তর ধাবিত হইতেছে।

শ্রীকেশব তাঁহার বিশ্বাসের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অনন্যসাধারণ পন্থা সম্পর্কে বলিতেছেন,—

"Faith is singular and moveth in its own ways, which are past finding out. Geography can not find its latitude and longitude......Verily its actions are unintelligible to the world, and its life is a deep mystery......It hath no respect for custom and speaketh and acteth outright as it thinketh."— True Faith.

আবার তিনি ইহার ব্রহ্মাভিমুখী অনন্ত গতি সম্পর্কে বলিতেছেন,—

"Faith is perpetual progress heavenward. It disdains the beaten track, it soars while others crawl. It scorns the world's control and defies its command—Thus far shalt thou go. God is its aim, it refuses to obey the law of limitation. Progress is its life, to stop is to die......Above the highest it seeketh a higher still, and beneath the deepest it seeketh a deeper still."—

True Faith.

শ্রীকেশব যে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া নববিধানের অনন্ত পথে অবিশ্রান্ত চলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ঐ শুন বঙ্গের বিখ্যাত দৈনিক পত্র "বাঙ্গলার কথা" কি বলিতেছে,—

"মানুষ অনেক আসে, অনেক চলিয়া যায়। কে তাহাদের খোঁজ রাখে ? কে তাহাদের স্মরণ করে ? তাহারা অপর মানুষের প্রতিধ্বনি, তাহাদের গায় ধর্ম্মের ছাপ, সম্প্রদায়ের ছাপ, শাস্ত্রের ছাপ। মাঝে মাঝে হঠাৎ অগ্নিবরণ কেতন উড়াইয়া দুই এক জন মানুষ আসে, যাঁহারা গীর্জ্জার নহে, মস্‌জদের নহে, কোন বিশেষ কালের নহে। তাঁহাদের প্রাণ অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্যোতিষ্ময়, দুরন্ত স্বাধীন তাঁহারা, একমাত্র সত্যের পূজারী। তাঁহারা চিরদিন অশান্ত, চিরদিন বিদ্রোহী, চলার মন্ত্র লইয়া তাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা পথিক। কেশবচন্দ্র ছিলেন চিরকালের এই বিদ্রোহী ও পথিকদলেরই একজন।"— বাঙ্গলার কথা (৮।১।২৯)

শ্রীকেশব প্রকৃতই "চলার মন্ত্র নিয়া চলিয়াছেন।" আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে তিনি স্বয়ং ভগবানের নিকটে নববিধানের আদি মন্ত্র "প্রার্থনাতে" দীক্ষিত হইয়া ঘরের বাহির হইলেন। এই প্রার্থনা-মন্ত্র ও চলার মন্ত্র একই কথা। তিনি প্রার্থনা যোগে ভগবানের নিকট হইতে নিত্য-নব পরিপোষণী শক্তি ও বীর্য্য লাভ করিয়া মহাতেজের সহিত পূর্ণতার পানে ছুটিয়াছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পক্ষে "সামান্য

শিবির” মাত্র; তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাসাধুর খাতিরেও যে সীমাবদ্ধ ভাব ও সংস্কার বুকে করিয়া এখানে অধিক দিন স্থির হইয়া থাকিবেন তাহা অসম্ভবের অসম্ভব।

ক। “শিবির হইতে বাহির।”

শ্রীকেশবের বিশ্বাস সম্পর্কে উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহার মর্ম্ম অন্য ভাবে প্রকাশ করিতে গেলে এই বলিতে হয় যে তিনি একমাত্র অনাদি অনন্ত পুরুষের উপাসক ও সেবক, তাই সসীম সংসারের শাসনাতীত। ঈশ্বরের তিনি অধীন, তাই সংসারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অনন্তের গভীর প্রেমাকর্ষণের ভিতরে পড়িয়া যিনি সজ্ঞানে অজ্ঞানে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারেই অনন্তের ক্রীড়া-পুতুল মাত্র, তাঁহার কি সংসারের কোন কথা শুনিয়া কিছু বলিবার কি করিবার আছে? তিনি যে ভগবানের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এই জন্যই শ্রীকেশব একবার তাঁহার জীবনের নিয়তি সম্পর্কে বিখ্যাত ষ্ট্যান্‌লী নিউমানকে বলিয়াছিলেন,—

“আমার সম্মুখে যে কি আছে তাহা আমি জানি না, উহা ঈশ্বরের হাতেই রাখিয়া দিতে হইয়াছে। গতকল্য আমি

যাহা ছিলাম আজ আমি তাহা নহি, এবং আগামী কল্য যে কোথায় যাইব তদ্বিষয় আমি অদ্য কিছুই জানি না।”—

খৃষ্টিয়ান্ ওয়ার্ল্ড্ (বঙ্গানুবাদ)।

কেশবজীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ঘটনাই এই দেখাইয়া দেয় যে তিনি ঈশ্বরের হাতে ছায়াবাজির পুতুল মাত্র। ভগবান্‌ই তাঁহাকে নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে ব্রাহ্মসমাজে নিয়া আসিলেন, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করাইলেন। ক্রমে যখন কেশবজীবনে নবধর্ম্ম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র বাড়িতে বাড়িতে পৃথিবীময় ব্যপ্ত হইয়া পড়িল, * তখন ক্ষুদ্র কলিকাতা ব্রাহ্ম-

---

* শ্রীকেশব তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্রের ক্রম-বিস্তার সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

“Time was when I served Calcutta as a little child, my services and my sympathies were restricted within the bounds of this metropolis. Years rolled on and the little infant grew into a boy, and I began to serve Bengal with a heart distended and sympathies enlarged, and as boyhood entered upon adolescence I stood up for all India. Nothing short of India would satisfy my ambitious soul, and I found joyful service in so extended a mission-field. And now in the prime of manhood, the Lord summons me to a still higher and larger stewardship. I am called to represent the interest, and minister to the wants, of a whole continent.”—

Asia's Message to Europe.

সমাজের ভিতরে থাকিয়া কাজ করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইল। ঈশ্বর সময় বুঝিয়া তাঁহাকে এই "সামান্য শিবির" হইতে বাহিরে নিয়া আসিলেন। তার পরে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া মাহেন্দ্রক্ষণে নববিধানের মগলীলা প্রকাশ্য ভাবে আরম্ভ হইল। এই লীলা-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকেশব ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"হে মুক্তিদাতা, বিধানের মালিক, সেই পুরাতন ব্রাহ্ম-সমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে, প্রায় অতীত হইল। একটা সামান্য শিবির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী। সেই এক ভাব, এই এক ভাব। পিতা, কোথায় আনিলে? এসিয়া, আমেরিকা আমাদের এক একটা ঘর হইল, পৃথিবী আমাদের বাড়ী হইল।......ছোট দলের বন্ধন দূর হইল; ছোট বন্ধন ঘুচিল; ছোট ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গেল। প্রেমের প্লাবন এসে সব ভাঙ্গিয়া দিল। পিতা, এ সমুদয় তোমার দয়াতে।"— দৈনিক প্রার্থনা (৬।২।১৮৮৩)

এই যে শ্রীকেশব ঈশ্বরের "জীবন্ত বিধাতৃত্বে" কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, ইহা নিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। শ্রীকেশবকে এই জন্য যারপরনাই নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও মনের কষ্ট কম ভোগ করেন নাই। কিন্তু বিধাতার বিধি কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

ঈশ্বর যেখানে স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা সেখানে কোন মনুষ্যের দোষগুণের কথা উঠিতেই পারে না। মহর্ষি কেন ব্রহ্মানন্দকে বিদায় করিয়া দিলেন, ব্রহ্মানন্দই বা কেন মহর্ষিকে ছাড়িয়া স্বাধীন-ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তাহার গূঢ় কারণ জানিতে হইলে একমাত্র ঈশ্বরেরই স্মরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক; কেননা এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য তিনিই দায়ী। ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষি আর কি করিবেন?

এই দুই মহাপুরুষ দুই ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তাঁহাদের প্রকৃতি ভিন্ন, রুচি ভিন্ন, ধর্ম্মজীবনের আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষি পৃথিবীতে আসিলেন পুরাতন ভারতের ঋষিভাব নব্য-ভারতের প্রাণে সঞ্চার করিয়া দিতে; ব্রহ্মানন্দ আসিলেন সংশ্লেষের যাদুমন্ত্রবলে এই হিন্দুভাবের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম্মের মূলভাব মিলাইয়া মিশাইয়া জীবন্ত চরিত্ররূপে এক মহাধর্ম্মবিধান প্রকটন করিতে। তাঁহারা অবশ্য যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী স্বয়ং ভগবান্। মহর্ষির কার্য্যক্ষেত্র হিন্দুস্থান, ব্রহ্মানন্দের কার্য্যক্ষেত্র নিখিল বিশ্ব! যতদিন আবশ্যক ব্রহ্মানন্দ মহর্ষির সঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করিলেন, তার পরে প্রভুর আদেশে তাঁহাকে বিশ্ব-সেবকরূপে মুক্তআকাশতলে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া তিনি অসীমের ভিতর আসিয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথ

ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষি এইরূপে বাহ্যতঃ পৃথক হইলেও আত্মিক ভাবে যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভিতরে অনুক্ষণ স্থিতি করিতে

ছিলেন তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহাদের হৃদয় ঈশ্বরেতে এক হইয়া গিয়াছে কাহার সাধ্য যে তাঁহাদিগকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচ্ছিন্ন করে? ঐ শুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রস্থানের পরে তাঁহাদের প্রথম মিলনের কথা উল্লেখ করিয়া কি বলিতেছেন,—

"আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুভাব আমার মনকে অতি মাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটী ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যপি আমার হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমন একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যপি মুদ্রিত আছে তাহা আমি বলিতে পারি না, এবং সেই মূর্ত্তিটী যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখন কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুধাবিত হয় তাহার হেতু পাই না।"—মহর্ষির আত্ম-চরিত।

খ। নববিধানের মহারাজ্য।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বিশ্বাসাত্মা পুরুষ শ্রীকেশব উদার অপার সত্যের জন্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিশেষ নির্দ্দেশে কলিকাতাব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া মুক্ত-আকাশ-তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যস্বরূপের অসীম রাজ্য! এখানে সকলেই সত্যের পূজারী, সকলেই মুক্তভাবে অনাদি অনন্ত "সত্যম্" যিনি তাঁহার পানে ছুটিয়াছে। এখানে বাধা প্রতিবন্ধক কিছুই নাই, কেননা—

"সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে, ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে। ইহার নিকট রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটীর উভয়ই সমান। ইহা লোক বিশেষে অথবা সম্প্রদায় বিশেষে অথবা জাতি বিশেষে বিক্রিত হয় না। ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল কালে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ ও উদার।"— আচার্য্যের উপদেশ (১১ই মাঘ, ১৮৬৫ খৃঃ)

শ্রীকেশব এখন পরিস্কার দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার হৃদিস্থিত ধর্ম্ম এই উদার জীবন্ত সত্যের উপরে সংস্থাপিত; এই জন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে সকল মনুষ্যের সমান অধিকার। "ইহা যেমন এসিয়ার, তেমনি ইয়োরোপ ও আমেরিকার; যেমন পূর্ব্ব কালের, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও ধর্ম্ম। অন্যান্য

ধর্ম্মের ন্যায় ইহা জাতিবদ্ধ বা সম্প্রদায়বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। মনুষ্যাত্মার সহিত এই ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী।"— শ্রীকেশবের উক্তির সার (২৫।১।৬৫)

শ্রীকেশব প্রত্যাদেশ যোগে চরিত্রগতভাবে এই নবজ্ঞানালোক লাভ করিয়া পঞ্চত্রিংশ ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে পবিত্র ১১ই মাঘ তারিখে গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন,—

"পরমেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, জগৎ আমাদের দেবমন্দির, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষপথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের গুরু ও নেতা।"

নববিধান

কেশবজীবনে বিশ্বাসের এই বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদার ভগবৎপ্রেম সংসারে মহামিলনের চিরশান্তিময় রাজ্য স্থাপনের জন্য সংশ্লেষ ও সমন্বয়কে সঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এখানেই প্রত্যক্ষ ভাবে নববিধানের মহালীলাভিনয় আরম্ভ।

অষ্টম অধ্যায়।

নববিধানের ক্রমোন্মেষ।

"O Father, Thou art ever new, and Thy light is ever fresh. Many a chapter of Thy saving gospel has yet to be written, and more deeply shall we hereafter enter into Thy counsels, becoming wiser and purer in the light of new dispensations, now veiled from us."—Sri Keshub (17/10/75)

আমি তৃতীয় অধ্যায়ে এই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে নববিধানের মূল সত্য ও তত্ত্ব বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি তাহা শ্রীকেশব ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের অনেক পূর্ব্বে স্বভাবের নিয়মে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরাদেশে নববিধানের প্রবর্ত্তকরূপে যাঁহার সংসারে আগমন, এবং যিনি নববিধানের আদর্শমানুষরূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত ও আদৃত, তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়া একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেশবজীবন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈধানিক ক্রমোন্মেষের এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ইহার অনেকটা প্রমাণ। এখন আরও কিছু প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীকেশব তাঁহার ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিয়া "Religion of Love" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; সমস্ত বিরোধ পরিহার করিয়া এক উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনসাধন ইহার বিশেষ লক্ষ্য। যথা—

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাবপ্রচার—১৮৬০

"Certainly the object of religion is to unite and bring together—not to separate, to consolidate the whole mass of mankind—not to divide it into countless sections, to attract, not repel, to make a brother, not an enemy......

"Oh, when shall that day of universal peace and joy arrive, when every man shall acclaim from the depth of his heart—God is my Father, Man is my brother? Say, is not a Christian, a Hindu, a Muhamedan your brother? Is not every man, whether an inhabitant of Asia, Europe, or America, born of the same Father. ?"

উপরোক্ত প্রবন্ধটী আগাগোড়া এই ভাবের লেখাতেই পূর্ণ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীকেশব আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই ঘোষণা করেন যে

পরমেশ্বর নিখিল মানবমণ্ডলীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, এবং স্থান, কাল, জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্ম-পূজার অধিকারী। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"The universe is the cathedral, Nature the high priest,—every man, whether an illiterate rustic or a profound philosopher, a throned monarch or a ragged clown, a native of Europe or of India, a man of the first or the nineteenth century, has access to his Father, and can worship and serve Him with faith and love."

সর্ব্বজাতির মহামিলন (১৮৬১)

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন তখন সেখান হইতে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, সকলে গলা ধরাধরি করিয়া সেতু পার হইয়া শান্তি-নিকেতনে যাইতেছেন এইরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিয়াছিলেন। নববিধানের এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়দ্যোতক ভাব ক্রমেই দিনের পর দিন তাঁহার প্রাণে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদিস্থিত এই ধর্ম্ম যে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য উদ্ভূত, এবং ভগবান্ তাঁহাকেই যে এই বিধানের প্রবর্ত্তকরূপে সংসারে পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নিঃসন্দেহরূপে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানিনা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীকেশব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"আমার অন্তরে ঈশ্বর একটী আদর্শ নিহিত করিয়া দিয়াছেন; যাহাতে তদনুসারে আমি ধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার করিতে পারি ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য।"— পত্রাবলী।

এখানেই শ্রীকেশব পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বরের আদেশে একটী নূতন আদর্শধর্ম্ম নিয়া সংসারে আসিয়াছেন; ইহা প্রচার করিয়া সমাজের সংস্কার সাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। আট মাস দশ দিন পরে (১১ই মাঘ) তিনি এই নূতন ধর্ম্মবিধানের অপূর্ব্ব বার্ত্তা কিরূপ অগ্নিময় ভাষাতে জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে।

নবযুগের আদর্শধর্ম্ম (১৮৬৫)

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীকেশব এই নবীন আদর্শধর্ম্মের গঠন ও উদারতা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

"Individuals being reformed and regenerated by faith, communities and nations will gather round the common Father, clad in the purity and righteousness of divine life, and constituting a vast spiritual fellowship,—a Kingdom

নববিধানের বিরাট সৌম্য মূর্ত্তি (1868)

whose subjects joyfully pay homage and loyalty to the King of kings, and dwell together in amity and peace under His benignant rule—a family of simplehearted and dutiful children, full of filial love towards God, and brotherly affection towards each other. National regeneration is a necessary consequence of individual regeneration."— Regenerating Faith.

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীকেশব "The Future Church" বিষয়ে বলিতে গিয়া ঘোষণা করেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম এক দিকে জাতীয় এবং অন্য দিকে সার্ব্বভৌমিক; ইহা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ফল। নিম্নে তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করা গেল—

শ্রীকেশবের ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ফল। ইহা এক দিকে জাতীয়, অন্য দিকে সার্ব্বভৌমিক (1869)

1. "The future creed of India will be a composite faith, resulting from the union of the true and divine elements of Hinduism and Mahomedanism, and showing the profound devotion of the one, and the heroic enthusiasm of the other......As regards Christianity and its relation to the future Church of India, I

have no doubt in my mind that it will exercise great influence on the growth and formation of that Church........... Surely the future Church of this country will be the result of the purer elements of the leading creeds of the day, harmonised, developed, and shaped under the influence of Christianity.

(2) "But the future Church of India must be thoroughly national, it must be an essentially Indian Church. The future religion of the world I have described will be the common religion of all nations, but in each nation it will have an indigenous growth, and assume a distinctive and peculiar character. All mankind will unite in a universal church, at the same time it will be adopted to the peculiar circumstances of each nation, and assume a national form."

The Future Church.

কেশব-জীবনে নববিধানের কি আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ!

শ্রীকেশব প্রচারিত ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের একটা "নূতন বিধান" এবং ভারতের পরিত্রাণের জন্যই যে ইহার অভ্যুদয় তাহা শ্রীকেশব

"ভারতাশ্রমে"
"বিধান" সাধন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। "এক ধর্ম্মের" আদর্শ সাম্‌নে রাখিয়া "এক ঈশ্বরের" চরণতলে দলগত ভাবে "এক পরিবারের" ভাব সাধন করাই "ভারতাশ্রমের" মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সাধনের প্রধান সহায় বিশ্বাস-সম্ভূত উদার নির্ব্বিকার প্রেম। বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন দলগঠন অসম্ভব, এবং দলগঠন ভিন্ন জাতীয় বিধানের কথাই উঠিতে পারে না। বিভিন্ন প্রকৃতির নর-নারী এই বিশ্বাস ও প্রেমের প্রভাবে একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া যখন একটী অখণ্ড দল রূপে প্রতীয়মান হয় তখনই বলা যাইতে পারে যে একটা "নূতন বিধানের" ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, নর-নারীর পরিত্রাণের জন্য ব্রহ্মকৃপার বিশেষ প্রকাশই "নববিধান"। ব্রহ্মকৃপা চিরদিনই নূতন রূপ ধরিয়া দেখা দেয়, তাই "বিধান" স্বভাবতঃ চিরনূতন।

"ভারতাশ্রম" প্রত্যক্ষ ভাবে এই ব্রহ্মকৃপালোক প্রকাশের একটী পথ; সংসারের শত শত বিঘ্ন বিপদ আসিয়াও এই প্রকাশ বন্ধ করিতে পারে নাই। ঈশ্বরদ্রোহীদের চক্রান্তে "ভারতাশ্রম" ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু নববিধান নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় আকার ধারণ করিল।

ক। বিধান নির্দ্দেশ।

১। শ্রীকেশবের যে সকল উক্তি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছি যে তিনি ভারতাশ্রমে অবস্থান কালীন (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে) একটী প্রার্থনার ভিতরে সর্ব্বপ্রথম "বিধান" শব্দ ব্যবহার করেন। আমি নিম্নে এই প্রার্থনার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"বিধান" শব্দের প্রথম ব্যবহার

"পিতা, বুঝিয়াছি তোমার বিধান বিশ্বাস না করিলে স্বর্গে থাকিয়াও নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নাথ, আর কেন অবিশ্বাস করি, তুমি এসেছ পৃথিবীতে, অবিশ্বাস করিব কেন? .... তুমি যখন আসিয়াছ তখন প্রাণের ভাই ভগ্নী-দিগকে, ডাকিয়া তোমার মুখ না দেখাইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব!

"বিধান" নিয়া বিধাতা স্বয়ং সংসারে অবতীর্ণ

"দিব্য চক্ষু দেও, দেখি তুমি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ, সকল কথা তোমার মুখ হইতে আসিতেছ, সকল বিধান তুমি ব্যবস্থা করিতেছ। জগৎকে উদ্ধার করিবে বলিয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টী পাপীকেও উদ্ধার করিবে।"

লীলারসময় শ্রীহরি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য

শ্রীকেশবকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া একটী বিশেষ বিধান প্রকটন করিতেছেন, এই সুসংবাদ তিনি যে নিঃসন্দেহ রূপে তখন প্রত্যাদেশ যোগে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এই প্রার্থনা তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

২। বিশ্বাসই যে এই বিধানের প্রথম স্বরূপ তাহা তিনি উপরোক্ত প্রার্থনার আরম্ভে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"নববিধানের" প্রথম স্বরূপ বিশ্বাস

"বিশ্বাস-রত্ন আমাদিগকে দাও। এই রত্নে যে কেবল আমরা বাঁচিব তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে সমস্ত জগৎ বাঁচিবে। যাহাতে আমরা বাঁচিব তাহা ত প্রিয় হইবেই, আবার যখন দেখি ইহাতে সমস্ত পৃথিবী বাঁচিবে, তখন ইহা আরও প্রিয় হয়।"

নবযুগধর্ম্মবিধান পরিত্রাণের বিধান; ইহাতে অটল বিশ্বাস ভিন্ন যে মুক্তির পথে চলা অসম্ভব তাহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইহার ক্রিয়া একদিকে ব্যক্তিগত ও দলগত, অন্যদিকে সর্ব্বজাতিগত।

৩। ভগবান্ যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের মঙ্গলের জন্য "বিশেষ বিধান" পাঠাইয়াছেন, এবং এই "বিশেষ বিধানে" অটল বিশ্বাস ভিন্ন যে আমাদের পরিত্রাণ নাই তাহা শ্রীকেশব ৯।৩।৭৪ তারিখের প্রার্থনাতে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমাদের মঙ্গলের জন্য নাকি **বিশেষ বিধান** করিয়াছ? নিজে নাকি কাছে থাকিয়া যাহার যাহা অভাব

মানবজাতির মঙ্গলের জন্য "বিশেষ বিধানের" অবতরণ

তাহা স্বহস্তে মোচন করিতেছ ?...শিষ্য ব'লে যদি দয়া ক'রে চরণতলে স্থান দিয়াছ তবে তোমার বিশেষ বিধানে আর অবিশ্বাস করিতে দিওনা।"

৪। এই বিশেষ বিধান যে জগতের পক্ষে "নূতন" তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীকেশব ২৮।২।৭৪ তারিখের প্রার্থনাতে ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছেন—

"নূতন বিধানে" ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা

"তুমি কি এই **নূতন বিধানে** মনুষ্যের হাতে সমুদয় ভার দিয়া চলিয়া গিয়াছ ? পিতা, আমরা আর কাহারও দাসদাসী হইতে চাহি না। তোমার কাছে বসিয়া তোমারই সেবা করিব, যখন তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর তখন তোমার চক্ষু যেমন স্নেহের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয় তাহা কি ভুলিতে পারি ? আমাদিগকে দুঃখ পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য তুমি যে কত ব্যগ্র, তাহা স্মরণ হইলে আর কি আমাদের মনে দুঃখ থাকে ? কি ছার সামান্য ধন, যখন ব্রহ্ম-ধন আমাদের ঘরে।"

নববিধানে মনুষ্যের কোন হাত নাই, ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু, প্রতিপালক, পরিত্রাতা। শ্রীকেশব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। শ্রীকেশব ভারতাশ্রমের প্রত্যেক ঘটনার ভিতরে

বিধানের খণ্ডাবতরণ প্রত্যক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রাণে ব্রহ্ম-প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন—

"যখনই বিশ্বাসী হইয়া আশ্রমের ঘটনা সকল পাঠ করি, তখনই দেখি সমুদয় বিধানগুলি তোমারই প্রেম-বায়ু হইয়া আসিতেছে—ইহার সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে একটীও গল্প, রূপক কিম্বা আখ্যায়িকা নাই, কিছুই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না। যাই একটী কাজ শেষ হইতেছে তখনই আর একটী বিধান পাঠাইতেছ। এবার থেকে স্পষ্টরূপে তোমার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে তোমার প্রেম-মুখ দেখিব।"—প্রার্থনা (২৭।২।৭৪)

নববিধানের দ্বিতীয় স্বরূপ প্রেম

নববিধানের প্রথম স্বরূপ যে বিশ্বাস তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আবার দেখিতেছি যে ইহার দ্বিতীয় স্বরূপ প্রেম।

৬। পবিত্রতা লাভের জন্য বিধানে অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীকেশব বলিতেছেন—

বিধানে অগ্নি-সংস্কার

বিধানের তৃতীয় স্বরূপ পবিত্রতা

"করুণা-সিন্ধু, যখন তুমি নিজে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, তখন তোমার করুণা উদ্দীপন করিব এই জন্য কি কাঁদিব ? আমাদিগকে বাঁচাইবে বলিয়া নিজে আগে থেকে বিধান প্রস্তুত করিয়াছ। এখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য গোপনে বসিয়া কত কার্য্য করিতেছ, যেখানে আমাদের চক্ষু কর্ণ যায় না। দয়াময়, আমরা যেন আর

বাহিরের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া না যাই। ভিতরে যদি অবিশ্বাস, অপ্রণয়ের গরল থাকে, তাহা যেন আর ঢাকিয়া না রাখি।...... তুমি সেই অগ্নি লইয়া ভিতরে এস—যাহা সমুদয় পাপ দগ্ধ করে। তুমি অগ্নি দিয়া আমাদের হৃদয় সংস্কার কর, চরিত্র সংস্কার কর। সব ভাই ভগ্নী তোমার অগ্নি-সংস্কারে সংশোধিত এবং নূতন হইয়া সকলকে পরিত্রাণের সংবাদ দিয়া আনন্দিত হই।"—প্রার্থনা (১৩৷৩৷৭৪)

শ্রীকেশবের এই উক্তি হইতে পরিস্কার বুঝা যায় যে নববিধানের তৃতীয় স্বরূপ পবিত্রতা। অতএব নববিধান চরিত্রগত করিতে হইলে বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটী স্বরূপ সাধন করা আবশ্যক।

৭। শ্রীকেশব "বিধানে বিশেষ ব্রত" সম্পর্কে তাঁহার দয়াল প্রভুর চরণে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিতেছেন—

"বিধানে" বিশেষ ব্রত—দাসদাসীর পরিবার গঠন।

"হে প্রেমময়, জগতের অধিপতি, আমাদের আশ্রমের গুরু, আজ বিশেষ রূপে তোমাকে আমরা প্রভু বলিয়া ডাকিতেছি। আমাদের সকলের হাতে এক একটী পবিত্র ব্রত অর্পণ কর। তোমার পবিত্র ব্রতের স্পর্শে মানুষ পাপী থাকিলেও পবিত্র হয়।......তোমার বিধানের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিজনের জন্য এক একটী বিশেষ ব্রত আছে। দাসদাসীদিগকে গ্রহণ কর। বড় আশা করিয়াছি তোমার ঐ চরণতলে একটী দাসদাসীর

পরিবার হইয়া, জীবনের সকল দুঃখ দূর করিব।" —প্রার্থনা (১৬৩।৭৪)

নবযুগধর্ম্মবিধানে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। এখানে প্রত্যেক নরনারী প্রভু পরমেশ্বরের দাসদাসী হইয়া পবিত্র সেবা-ব্রত পালন করিবেন। তাঁহাদের প্রাণ নিশিদিন ব্রহ্মপুরে বাস করিয়া ব্রহ্ম-সাধনায় মগ্ন থাকিবে, কিন্তু তাঁহাদের দেহ সংসারের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া জীবের সেবা করিবে।

৮। ভারতাশ্রমের বক্ষে গোপনে গোপনে একটী অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী দলের সঞ্চার হইতেছে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীকেশব বিধানের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিলে যে পরিত্রাণ নাই তাহা এই ভাবে বিধান-দেবতার চরণে নিবেদন করিতেছেন—

"বিধান যদি অন্ধকারে থাকে তাহা মানা না মানা সমান। প্রাণেশ্বর, আমাদের এবং পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তুমি এত আয়োজন করিতেছ, আমাদের চক্ষু যদি তাহা না দেখে তবে যে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না।…পিতা, আজকাল যে মেঘ আসিয়া তোমার সন্তানদিগের নয়ন ঢাকিয়াছে—যাহা তোমার বিধানকে দেখিতে দিতেছে না—শীঘ্র তাহা দূর করিয়া দাও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেরা যাহা বুঝিতে পারে, জ্ঞানীরা তাহা বুঝিতেছেন না; চক্ষে যাহা দেখিবার বস্তু, বুদ্ধি তাহা বুঝিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছে। পিতা, এই অন্ধকারের সময় তোমার বিধান বুঝাইয়া দেও।"—প্রার্থনা (২০।৩।৭৪)

উল্লিখিত বিধান-দ্রোহী দলের আবির্ভাব যে কি ব্যাপার তাহা পর অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

শ্রীকেশব যখন সদলে ভারতাশ্রমে সাধনভজনে নিরত ছিলেন তখন "বিধান" নামটী কি ভাবে আসিয়া প্রথম দেখা দিল, এবং কেমন করিয়া "নূতন বিধানের" নব নব তত্ত্ব প্রাত্যাহিক উপাসনার ভিতর দিয়া গভীর হইতে গভীরতর ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল তাহাই আভাসে বুঝাইবার জন্য নমুনা স্বরূপ তাঁহার কয়েকটী মাত্র উক্তি (যাহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে প্রত্যাদেশ যোগে তাঁহার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল) উপরে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীকেশব নূতন বিধানের ক্রম-বিকাশ স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া পূর্ণতার পানে ছুটিয়াছেন, এবং যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই তাঁহার জীবনের প্রসারতা ও গভীরতা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কেশবজীবন হইতে "বিধানকে" বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, কেননা "কেশবজীবন" বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা "নূতন বিধানেরই" জীবন্ত জ্বলন্ত প্রকাশ।

খ। "বিধানের সম্পূর্ণতা"।

শ্রীকেশবের বিশ্বাস সম্পর্কে আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ের আরম্ভে বলিয়াছি—

"তাঁহার বিশ্বাস সংসারের দৃষ্টিতে একেবারে অভিনব। ইহার পথ স্বতন্ত্র, গতি অনন্ত। অতীন্দ্রিয় অনন্ত লোকে ইহার স্থিতি ও বিকাশ-ভূমি, এবং অনাদি অসীম ব্রহ্ম ইহার এক মাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য। বিশ্বাসাত্মাপুরুষের সাধ্য কি যে তিনি নিজের অথবা অন্য কাহারও ইচ্ছামত সংসারের সাধারণ পথে চলিবেন, কিম্বা গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইবেন? তাঁহার জীবন-নদী অনন্তের টানে অনন্তের পানে অসঙ্খ্য বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া নিরন্তর ধাবিত হইতেছে।"

শ্রীকেশব প্রচারিত নবযুগধর্ম্মবিধান তাঁহার এই বিশ্বাসেরই প্রকট মূর্ত্তি, তাই তিনি আংশিক বিকাশ নিয়া কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? ঐ শুন তিনি ১৮৭৪ সনের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখ প্রার্থনা যোগে ভগবান্‌কে বলিতেছেন—

"তোমার বিধানের সম্পূর্ণতা কিরূপে হইবে দেখাইয়া দাও। নরনারীর পরিত্রাণের এক খণ্ড দেখাইয়াছ, আর এক খণ্ড দেখাও।"—প্রার্থনা (২৬।১২।৭৪)

লীলাবসময় শ্রীহরি যে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের এই প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা সকল তাহার সাক্ষী। যে দিবস তাঁহার অন্তর হইতে এই প্রার্থনা

উত্থিত হয় তাহার ২৭ দিন পরেই তিনি প্রকাশ্য ভাবে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে স্বর্গ হইতে ভারতে "নূতন বিধানের" অবতরণ গভীর স্বরে ঘোষণা করেন।—

"Behold that heavenly light in the midst of India! How bright! How beautiful! How it ascends, extends, and expands from day to day! Do you see it? It is the light of a New Dispensation vouchsafed by Providence for India's salvation."—

Behold The Light of Heaven In India (21.1.75)

যদিও তখন পর্য্যন্ত এই "নূতন বিধানকে" "নববিধান" নামে অভিহিত করা হয় নাই, তবুও আমরা এখন "নববিধান" বলিতে যাহা বুঝি তাহার কয়েকটী মূল মহাতত্ত্ব এই ঘোষণার সাহায্যে অতি সুন্দর ভাবে প্রচার করা হয়; যথা—

প্রথমতঃ—নিখিল মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণের জন্য, বিশেষ ভাবে ভারতের পরিত্রাণের জন্য, ভগবানের একটী "নূতন বিধান" ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই "বিধান" মুক্তিদায়িনী ব্রহ্মকৃপার বিশেষ প্রকাশ মাত্র। ইহা এক দিকে **জাতীয়**, এবং অন্যদিকে **সার্ব্বভৌমিক**।

দ্বিতীয়তঃ—এই "নূতন বিধানের" মাহাত্ম্যে প্রত্যেক নরনারী সহজ বিশ্বাস যোগে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন, ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ—এই "নূতন বিধানের" রাজ্যে নিখিল মানবমণ্ডলী বিশ্বাস-সম্ভূত "বিশ্ব-প্রেমের" অপূর্ব্ব লীলা-কৌশলে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরে এক হইয়া গিয়াছে। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক মানুষ, ইহাই এই "নূতন বিধানের" মূল মন্ত্র।

এই "নূতন বিধান" যে **যুগধর্ম্মবিধান** তাহা শ্রীকেশব ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর একটী প্রার্থনাতে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

পিতা, তুমি যুগে যুগে বিধান প্রেরণ করিতেছ, বিধানের অণ্ড ফুটিল, ভক্ত-পাখী নির্গত হইল, খাইল, উড়িল; আবার উৎকৃষ্টতর বিধানের অণ্ড ফুটিল, উৎকৃষ্টতর ভক্ত-পাখী বাহির হইল, খাইল, খেলা করিল, উড়িল। পিতা, এই বর্ত্তমান বিধানে তোমার বৈরাগী ভক্তেরা কি কি লক্ষণাক্রান্ত হইবে বলিয়া দাও।"

এখানে আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে শ্রীকেশব-প্রচারিত নবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় যুগধর্ম্মবিধান। এই সমস্ত ধর্ম্মবিধানের ভিতর দিয়া যে একটী ক্রম-বিকাশের ধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

ভক্ত-সখা ভগবান্ এই ভাবে তাহার প্রিয়তম নবভক্তকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া দিনের পর দিন কিরূপ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে এবং মধুর হইতে মধুরতর ভাবে নববিধান-লীলা প্রদর্শন করিলেন তাহা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী মহাত্মা জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের

২৫শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ) মানবজাতির পক্ষে একটী মহা দিন, কেননা উক্ত তারিখে শ্রীকেশব ঈশ্বরের বিশেষ আদেশে শান্তি-পতাকা উড়াইয়া এবং শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া "নববিধানের" পূর্ণাবতরণ পৃথিবীতে ঘোষণা করেন; বলা বাহুল্য যে উক্ত তারিখেই বর্ত্তমান বিধানকে সর্ব্বপ্রথম "নববিধান" নামে অভিহিত করা হয়। এই সমস্ত কি যে মহাব্যাপার তাহার একটু একটু আভাস আমরা ক্রমে পাইতে পারিব। আমি এখানে শুধু শ্রীকেশবের একটী প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব—

"Ever-waking God, behold the car of Thy New Dispensation is continually moving onward and upward. It is never at a stand-still like the other religions of the world. In them we see stagnation and want of vitality: but the vessel of the New Dispensation is ever moving forward from new to newer regions of Thy holiness and love. God of life, never allow us to languish; but help us to receive Thy renewing Holy Spirit without ceasing. Prayers (June, 1881)

শ্রীকেশবের এই প্রার্থনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে **নববিধানের বিকাশ অনন্ত।** ইহা চিরকালই ভগবানের নূতন হইতে নূতনতর প্রকাশের ভিতর দিয়া

মানবজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে; এই গতির আর বিরাম নাই। অতএব নববিধান কোন দিন পুরাতন হইবে না। **নববিধান চিরনবীন।**

নবম অধ্যায়

কেশব-দ্রোহীদলের আবির্ভাব

"তোমরা না এলে কি নববিধান আসিত? শত্রুদের দ্বারা কত উপকার।"—শ্রীকেশব।

বিরোধীদল সৃষ্টির মূল কারণ

অনেকের বিশ্বাস যে "কুচবিহারবিবাহই" * ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বিরোধীদল সৃষ্টির (এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের) মূল কারণ, কিন্তু তাহা একেবারেই মিথ্যা। এই বিদ্রোহের নিগূঢ় কারণ শ্রীকেশব নিজেই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি "কুচবিহার বিবাহের" ১৩ বৎসর পূর্ব্বে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকাইয়াই যেন বলিয়াছিলেন,—

* ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ শ্রীকেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহার ষ্টেটের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

"As faith advances the reprobate world waxes wrathful and malicious; charges it with arrogance and selfishness, and condemns it as a dangerous imposter. If faith still persists in its obstinate work, the world's tribunal passes severer sentence. Deadly tortures are inflicted, and behold the martyr of faith glorified."—

True Faith.

বিশ্বাসাত্মাপুরুষ শ্রীকেশবের এই বাণী কি আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ঐ শুন মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র তাহার "Life of Keshub Chunder Sen" নামক গ্রন্থে এই সম্পর্কে কি লিখিয়াছেন,—

"From what has been said of the Bharat Asram libel case and various other calumnies

বাহাদুরের শুভ বিবাহের বাগ্দান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রায় ৩ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮০ সনের ২০শে অক্টোবর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়; ইহাই হইল আসল বিবাহ। মধ্যবর্ত্তীকালে মহারাজা শিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরোধেই বাগ্দান অনুষ্ঠান ("Betrothal") সম্পন্ন হয়।—Vide Mr. Dalton's D. O. letter dated 22 nd. January, 1878, to Keshub Chunder Sen.

spread about this time, it will be abundantly clear that in the very bosom of the community of which Keshub was the recognised leader, there was slowly springing up a nucleus of men who differed very deeply from him in view and principles, and wished to see the downfall of his influence in the Brahmo Somaj. The first doctrine to which they specially objected was the reverence and faith which Keshub taught must be accorded to the Great Men of the world, the prophets and elder brothers of mankind, who came to establish their several ideals of spirituality. Since Keshub's lecture on "Great Men" in 1867, the doctrine was making steady progress in the Brahmo Somaj of India, and the more it developed, the more it led to the suspicion in some minds that Keshub's teaching of such things meant the encouragement of man-worship in general, and his own worship in particular.........Then, in the second place, Keshub's teaching on special Providence was also strongly objected to. ......When in addition

to all this the doctrine of Inspiration was taught, namely, that the Holy Spirit breathed His impulses into the souls of faithful devotees, and directly commanded and guided them on all important emergencies of life, the rationalistic instincts of a section of men in the Brahmo Somaj were too greatly shocked. In the third place, they protested against some of Keshub's ideas on social reform. They complained he did not give sufficient emphasis to the emancipation of woman. A controversy arose about this time in the Brahma Mandir as to whether the ladies should be seated in a reserved covered gallery or promiscuously among the male congregation. And so warm did the controversy become, that it very nearly resulted in a rupture among the progressive members of the Brahmo Somaj of India. These signs of disagreement first showed themselves in 1872, but in 2 years became still more marked. The opponents of Keshub's influence, who are now the most prominent members of the Sadharana Brahmo

Somaj, started a magazine called the "Samadarshi", embodying these views, about 1874. They also tried to start a rival congregation. But Keshub's genius was still so paramount that such efforts failed. They, however, felt continually deeper and deeper distrust of Keshub's ideas and motives. They gradually ceased to attend the services of the Brahma Mandir. At some of the congregational meetings they indulged in long and painful disputes tending to question Keshub's authority, and the justice of his measures. The personal demenour, the devotional exercises, the private self-denials of Keshub and his intimate friends were repeatedly criticised, and set down as sectarian, unnatural, mischievous."

প্রতাপচন্দ্রের এই বিবৃতি হইতে নিঃসন্দেহরূপে জানা যায় যে কুচবিহারবিবাহের প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, কেশবদ্রোহীদল নবধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান আরম্ভ করে; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতাশ্রমকে আঘাত করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাতাকে পরাজিত করা। শ্রীকেশব এক উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ

সম্মুখে রাখিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের পুণ্যচরণতলে দলবদ্ধ ভাবে "এক পরিবারের" ভাব সাধন করিবার জন্যই ১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এই অভিনব আশ্রম স্থাপন করেন; ইহার কার্য্য সবদিক্ দিয়া অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল। বিরোধীদল তাই মনে করিলেন যে এই প্রতিষ্ঠানটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে কেশব সেন ভালমতই জব্দ হইবেন। এই অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা বড়ই ঘৃণিত। আমি এই সম্পর্কে নিজে কিছু না বলিয়া প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ভারতাশ্রমে" বিদ্রোহের আরম্ভ (১৮৭২)

"The five years that the Bharat Asram lasted it was a useful delightful institution. It's influences have changed and elevated the careers of many Brahmo families. Its memories, its friendships are undying in their sweetness and goodness to many souls...... ...... But amidst these congenial elements there was also an under-current of discord. There were some lay Brahmos whose difference with the missionaries were very serious. They have all joined the Sadharana Somaj now, but for a

number of years before they left, they showed the tendency of separating from Keshub's movement. For various private provocations some of them spread slanderous reports against the Bharat Asram. The calumny directed personally against Keshub and his most trusted disciples, took such a virulent character, and formidable proportions, that in the interest of the Brahmo Community, he was obliged to prosecute a Vernacular paper in which the charges repeatedly appeared. ......There was no reasonable doubt about the result of the lawsuit, but just as his counsel was arguing the points, Keshub said that even if in that stage of the case the offenders withdrew their statements, and expressed contrition for what they had done, he would stop the proceedings. The defendants had the good sense to accept this offer, and made an apology. The case accordingly was withdrawn. The honour and sanctity of the institution were sufficiently vindicated, and the impartial public felt great respect for the forbearance which the

leader of the Brahmo Somaj showed to his enemies at that critical time."—

Life of Keshub Chunder Sen

বঙ্গের বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন ক্ষমতাশালী মেম্বর। তিনি যৌবনে কেশবদ্রোহীদলের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং শ্রীকেশবের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেন নাই। এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তিনি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের "প্রবাসীতে" যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইতিহাসের দৃষ্টিতে মূল্যবান বলিয়া নিম্নে আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করিলাম ;—

বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্য

"কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একটা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের অলোক-সামান্য বাক্-বিভূতির ও চরিত্রের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজে একটা অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।...আনন্দমোহন, শিবনাথ, দুর্গামোহন প্রভৃতি ব্রাহ্মেরা কেশবচন্দ্র ও তাঁহার প্রচারক-দলের আনুগত্য অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একরূপ কোণ-ঠাসা হইয়া

পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-নিকেতনে যে সকল ছাত্রেরা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রচারকদলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা সে মণ্ডলীর বাহিরে ছিলাম। সে শাসন মানিয়া চলা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল।"—

সত্তর বৎসর।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ১৩৩৪ সালের মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" এই সম্পর্কে আরও পরিস্কার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মদিগের সমাজশাসন এবং মতবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকবর্গ ই করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মদিগের মতের এবং আচার আচরণের স্বাধীনতা ইহাদের শাসনাধীনে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। যাঁহারা সত্যাসত্য নির্ণয়ে নিজেদের বিচারবুদ্ধিকেই অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে যাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে আর কাহারও শাসন মানিতে রাজী ছিলেন না, তাঁহাদের একদল কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন অনুচর-বর্গের এই নূতন বন্ধন সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্য ভাবে তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নূতন মতবাদ ও সাধনপ্রণালীর প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। শিবনাথ এই প্রতিবাদী দলের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। * ইহারা নিজেদের মত ও আদর্শ

---

* স্বাধীনতার দোহাই দিয়া যথার্থ স্বাধীনতার উপাসক যিনি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা "বিচার বুদ্ধির" উপযুক্ত কার্য্য বটে! ঐ শুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নেতা প্রিন্‌সিপ্যাল্ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র শ্রীকেশব সম্পর্কে কি বলিতেছেন,—

প্রচার করিবার জন্য একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। নাম ছিল তার 'সমদর্শী'। শিবনাথ 'সমদর্শীর' সম্পাদক হইয়াছিলেন।"— সত্তর বৎসর।

এ সমস্তই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্যের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষ্যের তুলনা করিলেই পাঠকগণ প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবেন। পাল মহাশয় সরল মনে স্বীকার করিয়াছেন যে "আনন্দমোহন, শিবনাথ, দুর্গামোহন প্রভৃতি ব্রাহ্মেরা" কুচবিহারবিবাহের অনেক পূর্ব্ব হইতেই কোন সাধনভজনের কিম্বা শাসনবিধির ধার না ধারিয়া বুদ্ধিবিচারসম্মত একটী

"আমি ক্লাসে ছাত্রদিগকে রাস্কিনের এক অধ্যায় পড়াইবার সময় বলিয়াছিলাম যে, 'জগতে কোন বস্তুরই স্বাধীনতা নাই, সৌরজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলেই এক অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা। স্বাধীনতা কোথাও নাই—স্বাধীনতা কোথাও নাই।' এই কথা শুনিয়া ছাত্রেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহারা যেন শিহরিয়া উঠিল। তখন আমি সেই গ্রন্থকারের আর একখানি গ্রন্থের এক স্থান পাঠ করিয়া দেখাইলাম যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে। স্বেচ্ছা প্রবৃত্তির অধীনতা নীচ শক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ শক্তির, ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁহারাই যথার্থ স্বাধীন। এই স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন কেশবচন্দ্র। তিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়া ব্রহ্মানুগত তেজস্বী হইয়াছিলেন, এবং সকল প্রকার অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কেবল ঈশ্বরের অধীনতাই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন।"—(৮।১।১৯১০—স্মৃতি সভা)

আমি এই সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকগণকে "জীবনবেদের" পঞ্চম অধ্যায়—"স্বাধীনতা" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রতিদ্বন্দ্বী পরিষদ্ খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কুচবিহারবিবাহের বাগ্দান অনুষ্ঠান তাঁহাদের বহু বৎসরের এই আয়াসকে সম্যকরূপে সফল করিবার একটী দুর্লভ সুযোগ মাত্র।

ক। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার সাক্ষ্যের এক স্থলে বলিয়াছেন যে "শিবনাথ এই প্রতিবাদী দলের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছিলেন।" এই কথা সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে। আসল কথা এই যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবদ্রোহীদলের শুধু নায়ক নহেন: এই দলের সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনিই। নববিধানের সত্যনিষ্ঠ "প্রেরিত" মৌলানা গিরীশচন্দ্র তাঁহার এক স্মৃতি-লিপিতে সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কিছুকাল পরে পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইবার জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকটে আবেদন করেন। তাঁহার ন্যায় একজন সুবক্তা, সুকবি ও সুপণ্ডিত প্রচারকের পদ গ্রহণ করিবেন ইহাতো সুখেরই কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা দুইজন ছিল। এই দোষ তাঁহার নিজের ইচ্ছাকৃত না হইলেও এক সঙ্গে একাধিক পত্নীকে নিয়া ঘর করা ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে ঘোরতর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া সমাজ হইতে তাঁহাকে জানান হয় যে ইহার প্রতিকার না হইলে

প্রচারকের উচ্চব্রত পালন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয় দূরে সরিয়া পড়েন। এই ঘটনাটীই হইল আত্মবিগ্রহের প্রথম সূত্রপাত।

পণ্ডিত শিবনাথ এই ঘটনার পর হইতে নানা উপায়ে দলবল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যখন দেখিলেন যে তাঁহার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে তখন প্রকাশ্য ভাবে শ্রীকেশবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার সাধনক্ষেত্র "ভারতাশ্রম" ধ্বংস করা এই বিদ্রোহীদলের প্রথম কীর্ত্তি ; ইহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে।

সাধারণব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য সভ্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পণ্ডিত শিবনাথ কেন শ্রীকেশবকে পরিত্যাগ করিলেন তাহার কারন প্রদর্শন করিতে গিয়া "গ্রহ বৈগুণ্যের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে এক পত্রে (যাহা ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল) লিখিয়াছিলেন,—

"হিন্দু-সংস্কার অনুসারে 'গ্রহ-বৈগুণ্য' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। অশ্লেষা ও মঘা মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ইহাও হিন্দু সংসারে চিরবিদিত। আচার্য্য, উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় হইলেও, কেশবচন্দ্রের প্রতি আপনার প্রচুর সম্মানের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার প্রতি আপনার অশ্লেষার দৃষ্টি। মঘার মারাত্মক আক্রমণ গোপনে গোপনে কার্য্য করিতেছে কেন ?"

অতএব শিবনাথ অতঃপর শ্রীকেশবের জীবনে যে ভাল বলিয়া কিছু দেখিতে পান নাই সেই জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। শাস্ত্রীজী আর কি করিবেন? তাঁহার দৃষ্টিভ্রমের জন্য যদি দোষ দিতে হয় তবে মানবজাতির ঐ দুই পরম শত্রু মঘা ও অশ্লেষার দোষ দাও! কিন্তু এই সম্পর্কে সকলেই একটা কথা মনে রাখিবেন। শ্রীকেশব যে অতীন্দ্রিয় সত্য-লোকের অধিবাসী সেখানে কোন কুগ্রহের ক্রুর দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে না; কেননা সেই দেশ মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে চিরপূর্ণ!

শ্রীকেশবের সম্পর্কে শিবনাথের মনের ভাব যে কারণেই বিদ্বেষপূর্ণ হউক না কেন ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে এই ভাব শাস্ত্রীজীকে শত্রুতাসাধনের শেষ সীমাতে নিয়া ফেলিয়াছিল। এই জন্যই চণ্ডীচরণ এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনি আপনার নিজের ভাষায় কেশবচন্দ্রকে কি কিছু বলিতে বাকী রাখিয়াছেন? মানুষ মানুষকে আর কি বলিবে?"—(নব্য ভারত, ভাদ্র, ১৩১৯)

শিবনাথ কি প্রণালী অবলম্বনে কেশবদলনব্রত সাধন করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্তই চণ্ডীচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; এখানে নমুনা-স্বরূপ একটী মাত্র প্রকাশ করিতেছি। বন্দো-পাধ্যায় মহাশয় এক পত্রে শাস্ত্রীজীকে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রদ্ধাস্পদ ৺রামতনু লাহাড়ী মহাশয়ের জীবনীতে কেশব-চন্দ্রের ছাত্রজীবনের সামান্য একটা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ভাবে

বর্ণনা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই আপনি নিন্দার পাত্র হইয়াছিলেন। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামতনু বাবুর জীবনচরিতে কেশব বাবুর বাল্যজীবনের একটা ভ্রম বা অসাবধানতাকে উত্তমরূপে স্থায়ী করিবার প্রয়াস আপনার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল। আপনি সে জীবনচরিতে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি এইরূপ ভূমিকা করিয়া সে সময়ের অনেক ব্যক্তির বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছেন তাঁহাদের আর কাহারও সম্বন্ধে কি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষা বিষয়ক * ত্রুটীর ন্যায় কোন প্রকার সামান্য কি বৃহৎ ত্রুটী দেখিতে পান নাই?......লিখিতে বসিয়াছিলেন রামতনু বাবুর জীবনচরিত, তাতে আপনার আচার্য্য ও উপদেষ্টার কোষ্ঠী প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল?"— নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

---

* অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে শ্রীকেশবের এই "ত্রুটী" পণ্ডিত শিবনাথের কল্পনা হইতে প্রসূত। "Indian Mirror" পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক মহামান্য নরেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে শ্রীকেশব এই ব্যাপারে একেবারে নির্দ্দোষ; আমি এখানে শুধু নরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য আংশিক ভাবে প্রকাশ করিতেছি। Indian Mirror পত্রিকায় প্রকাশিত "Keshub Chunder Sen And His Times" শীর্ষক প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,—

"Keshub and I were first cousins, his father and mine being brothers; he was four years older than myself, and we grew up and were brought up together in our ancestral house. I was Keshub's constant

শাস্ত্রী মহাশয় শুধু ব্রহ্মানন্দদেবের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কালি নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি বিশেষ ভাবে কেশব-প্রচারিত ধর্ম্মকে পৃথিবীর চক্ষে অবজ্ঞার বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কিরূপ কুটনীতির চাল চালিতেন তাহারও একটী মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শন করিতেছি: সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভ্য ডাক্তার ভি. রায় বঙ্গদেশের

companion through boyhood; we read, played, ate and slept together. No thought of his young mind was hidden from me, and none of mine was hidden from him."

বাল্য ও যৌবনের এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু যিনি এবং সমস্ত ভারতময় বিস্তৃত যাঁহার খ্যাতি, তিনি কেশবের জীবন সম্পর্কে কোন কথা বলিলে তাহা উড়াইয়া দেওয়ার সাধ্য নাই। তিনি উপরোক্ত প্রবন্ধে এই পরীক্ষা বিষয়ক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"I wish to say at once that this is a libel on the memory of the good departed man. Keshub and myself lived under the same roof. None of our family heard of the incident as it has been related. What actually happened was this: When Keshub was sitting at the examination, one of the boys near him spoke to him. Keshub who was naturally polite and affable, replied to his fellow-student, with the result that both of them were sent out of the examination-hall. He described the incident to me on his return home, and from what I heard I did not think he was to blame. As a matter of fact, Keshub from his childhood was of a religious and meditative disposition."

একটী সর্ব্বজনপরিচিত সুধী সন্তান; তিনি ১৯২৩ সনের ২৯শে জুলাই তারিখের Indian Messenger পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"Keshub Chunder Sen is a much misunderstood religious teacher, misunderstood not only by others but also by his immediate followers. In the Sunday Mirror of October 23rd. 1881, he contributed an article under the heading – 'What is the eclecticism of the New Dispensation ?' and in it he explained his doctrine—all religions are true. I do not find it dealt with by his biographers, P. C. Mazumdar and Gourgobinda Ray. Shibnath Shastri criticises it adversely in his 'History of the Brahmo Somaj' ; but while he quotes two most important sentences from the article he leaves out an equally important one which limits the whole proposition."

পণ্ডিত শিবনাথ নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য Sunday Mirror পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকেশবের প্রবন্ধের কোন্ অংশ বাদ দিয়া কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধাস্পদ ভি, রায় দেখাইয়াছেন,এবং এই ভাবে শেষ কথা বলিয়াছেন,—

"I can not hope that socialists (and some of

them have the reputation of being learned) will cease to misrepresent Keshub and to declare that he accepted the mythologies of all established religions; but I venture to hope that all sincere and thoughtful men, who had no first-hand knowledge of Keshub's article will think twice before accepting such charges against the greatest religious teacher of Modern India."

পণ্ডিত ভি. রায়ের এই মন্তব্যের উপর আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমাদের দেশে একটী প্রবচন আছে যে "আগুন ঢাকিয়া রাখা যায় না"। সত্যের ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ বস্তু কোথাও আর আছে কি?

পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহার দীক্ষা-গুরুকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য এতদূর অগ্রসর হইলেন, আর শ্রীকেশব কি করিলেন? তিনি যে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহার দুরন্ত শিষ্যটীকে অতি আদরের সহিত হৃদয়ের ভিতরে রাখিয়াছিলেন তাহার জলন্ত প্রমাণ স্বরূপ একটী ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। সমদর্শী চণ্ডীচরণ অতি দুঃখের সহিত শিবনাথকে লিখিয়াছিলেন,—

"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতার লর্ড বিশপ, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখিতে

আসিয়াছিলেন। এই তিন ব্যক্তির আগমন-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের লোকান্তর গমনের কি তৎপূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সে দলে আপনি ছিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে ছিলাম। সেই দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও কেশবচন্দ্র আপনার প্রতি কিরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিয়া কত কথা বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেগুলি কি আপনার স্মরণ নাই? সেই শেষ বিদায় কালে তাঁহার স্নেহমমতা প্রদর্শন, মিলনের জন্য হৃদয়ের সে ব্যাকুলতা প্রকাশ এবং রোগ যন্ত্রণার তীব্রতায় বাক্যস্ফুরণে অক্ষমতা নিবন্ধন উপস্থিত সকলের নীরব অশ্রুপ্রবাহ কি আপনার স্মরণ নাই? দশ বার জন দর্শকের ভিতর হইতে আপনাকে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া কত কি বলিবার প্রয়াস পাইলেন, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য যদি আপনার স্মৃতি-পটে চির-মুদ্রিত না হইয়া থাকে, তবে আর আমার বলিবার কি আছে?"

(নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)

কোন কোন সময় আমার মনে এই রূপ চিন্তার উদয় হয় যে পণ্ডিত শিবনাথের ন্যায় একটী শক্তিশালী লোক স্বাধীনতার নামে বুদ্ধিবিচার ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তির রাজ্য স্থাপনের জন্য তাঁহার দীক্ষা-গুরু শ্রীকেশবের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে তাঁহার নিজের এবং দেশের পক্ষে যারপর নাই মঙ্গলকর হইত। ব্রহ্মানন্দের

বিশ্বাস-চক্রের ভিতরে থাকিয়া নববিধানের নবজীবনপ্রদ আলো ও বাতাস পাইতে পারিলে তিনি দেবাঞ্ছিত কোন্ গৌরবে না গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন ? গৌরগোবিন্দ, গিরীশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি নববিধানপ্রেরিতগণ পূর্ব্বে কি ছিলেন এবং এই পরশমণির পরশগুণে পরে কি হইয়া গেলেন ! ক্ষুদ্র একজন দারোগা প্রকাশ পাইলেন নবালোকদীপ্ত "উপাধ্যায়" রূপে ; নগণ্য একটী পণ্ডিত জ্বলিয়া উঠিলেন ইস্‌লামশাস্ত্রবিৎ তেজোময় "মৌলানা" রূপে ; কবির দলের একজন সামান্য সরকার প্রতিভাত হইলেন পরমভক্ত "প্রেমদাস" রূপে ! এইরূপ আরও কত অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। আর এই প্রতিভাশালী উচ্চশিক্ষিত প্রখর-বুদ্ধি পণ্ডিত শিবনাথ ? ইহা এখন ভাবিলেও প্রাণে বড় ব্যথা পাই। কিন্তু বিধাতার বিধি কে লঙ্ঘন করিতে পারে ? ধর্ম্মবিজ্ঞানরাজ্যের ইহাই চিরন্তন ধারা যে এক একটি বিশেষ বিধানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বিধানদ্রোহী দলেরও আবির্ভাব হয়, অন্যথা বিধানের পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ অসম্ভব। আঁধারেই আলোকের বিমল দীপ্তি ; আঘাতেই চন্দনতরুর সুগন্ধ বিস্তার ; যেখানে বাধা সেখানেই শক্তির অবন্ধ্য অভিব্যক্তি। পূর্ব্বতন বিধানেও যা, নববিধানেও তা।

খ। কুচবিহারবিবাহ ও ঈশ্বরের আদেশ।

"কুচবিহারবিবাহনিবন্ধন" উপলক্ষে যখন শ্রীকেশবচন্দ্রের মাথার উপর দিয়া ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান বহিয়া যাইতেছিল, এবং নিন্দা, গ্লানি, লাঞ্ছনা, অপমান চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্রমাগত তাঁহার উপর বর্ষিত হইতেছিল, তখন তিনি কি আশ্চর্য্য ভাবে বিশ্বাসের তেজ দেখাইয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিয়া গিয়াছেন। আমি এখানে মৌলানা গিরীশচন্দ্রের বিবৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

"একদিন রাত্রিতে কমল-কুটীরের উপরের বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আমরা অনেকে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য্যকে এ প্রকার বলেন, এই বিবাহের আন্দোলনে পড়িয়া বন্ধু সকল শত্রু হইয়া উঠিল, আপনার লোক পর হইয়া যাইতে লাগিল, ইংলণ্ডে আমাদের আত্মীয় মিস্ কলেট্ প্রভৃতিও বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজ যে চূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র তেজের সহিত এইভাবে বলেন, আমি কাহারও কথা শুনিয়া কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া চিরকাল চলিতেছি, চলিব, তাহাতে পৃথিবী যদি চূর্ণ হইয়া যায় গ্রাহ্য করি না। আমি ফলাফল চিন্তা ও পার্থিব বুদ্ধির ধার ধারি না। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কপট ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন

হইবে তাহার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মনামধারী অসার অবিশ্বাসী লোক টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। স্বর্গের নূতন আলোক আসিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের নূতন জীবন হইবে। ঈশ্বরের আদেশে কি তোমার বিশ্বাস নাই? জানিও এই সূত্রে মহাব্যাপার হইবে। চতুর্দ্দিক্ হইতে যত তীক্ষ্ণ শর আসে, আসুক, আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিব, তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। আমি আদেশ পালন করিতে যাইয়া যদি আমার একটী বন্ধুও না থাকে, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি। আদেশ বিচার তর্ক ফলাফল-মূলক নহে। প্রভু আজ্ঞা করেন ইহা কর, অনুগত ভৃত্য তাহা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ আদেশ পালনে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে, এক এক সমাজ ও রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে যে প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে না? কেহ কেহ বলিয়া ছিলেন, রাজা যে ব্রাহ্ম থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তাহাতে তিনি বলেন, পরে রাজা ঘোর দুর্নীতিপরায়ন, দুশ্চরিত্র হইতে পারেন, আমার কন্যারও পরিণাম কি হইবে আমি কিছুই জানি না। আদেশ পালন করিতে যাইয়া আশু নানা অনিস্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জগতের স্থায়ী মহাশুভ ফল যে উৎপন্ন হইবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে?'—আচার্য্য এইভাবে অনেক কথা মহাতেজের সহিত বলিয়াছিলেন।"

গ। কুচবিহারবিবাহনিবন্ধন।

(মেজিষ্ট্রেট্ যাদবচন্দ্রের সাক্ষ্য)

কুচবিহারবিবাহের বাগদান অনুষ্ঠান যখন সম্পন্ন হয় তখন শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কুচবিহারষ্টেটের মেজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনিই বাঙ্গলাগভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুরোধে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কুচবিহারের মহারাজার সহিত শ্রীকেশবের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শুধু ঘটকের কাজ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। এই বিবাহসম্পর্কীয় অনেক ব্যাপারেই তিনি লিপ্ত ছিলেন, তাই তাঁহার কথার মূল্য সামান্য নহে। তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর একবার (১৮৯৬ সনে) বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রামে গমন করেন। তখন আমি স্কুল-পরিদর্শক কর্ম্মচারীরূপে সেখানে স্থিতি করিতে ছিলাম। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৃহস্থপ্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজেশ্বর গুপ্ত ও সেবক কাশীচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যাই। কথা প্রসঙ্গে যাদব বাবু কুচবিহারবিবাহের ব্যাপার উল্লেখ করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের অসাধারণ বিশ্বাস ও দেব-চরিত্রের চাক্ষুষ প্রমাণ নিজে যাহা পাইয়াছিলেন তাহা এমনই শ্রদ্ধার সহিত বর্ণন করিতে লাগিলেন যে আমরা

সকলে মোহিত হইয়া গেলাম। সে করুণ কাহিনী কখনও ভুলিবার নয়। তাঁহার সাক্ষ্যের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কেশবচন্দ্রের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব তুলিবার সময় পরিস্কার ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে অনুষ্ঠানটী শুধু "Betrothal" বলিয়াই গণ্য হইবে, এবং ইহার সঙ্গে পৌত্তলিকতার কোন সংশ্রবই থাকিবে না। এই সম্পর্কে বরপক্ষ হইতে তখন কোন আপত্তিই হয় নাই। কিন্তু বাগ্দান ক্রিয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্বে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তের ফলে রাজপরিবারের লোক একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন; তাঁহারা জেদ ধরিলেন যে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে শালগ্রাম রাখিতেই হইবে এবং হোম করিতেই হইবে। গোলমাল ক্রমে বড়ই জটিল হইয়া উঠিল। নির্দ্দিস্ট তারিখে সন্ধ্যাকালে সমস্ত রাজবাড়ী আলোকমালায় ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল; রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে রাজমাতার আদেশে হঠাৎ সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইল! তখন সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে সত্যই বুঝি বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তাহা কি আর হয়? বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা পালন করিতেই হইবে। ডেপুটীকমিশনার হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমাতা আর তাঁহার জেদ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল ও নানা সুরে বাদ্য

বাজিতে লাগিল। সেই সময় কেশবচন্দ্র কি করিতেছিলেন? তিনি যেন সংসারে একাকী। রাজপরিবারের নিকটে তাঁহার লাঞ্ছনা ও অপমানের শেষ নাই। বিরোধীদল নানা প্রকারে তাঁহার নিন্দা ও গ্লানি প্রচার করিয়া দেশকে গরম করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার অনুরক্ত অনুগামিগণ পর্য্যন্ত যেন তাঁহার সম্পর্কে বিমুখ, ইহারা কেহই কেশবচন্দ্রের কাছে বড় ঘেসিতেছেন না। সকলেরই হৃদয়ে উত্তেজনা, মন নৈরাশ্যে পূর্ণ। কিন্তু কেশবচন্দ্র? তিনি স্থির, শান্ত, গম্ভীর, অচল, অটল! এমন যে প্রলয়কাণ্ড সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, যেন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত! অধিক রাত্রে যখন সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দিবার জন্য যাইয়া দেখিলেন যে তিনি একটী প্রকোষ্ঠে একাকী ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া আছেন! তাঁহার মুখমণ্ডল কি এক অপার্থিব জ্যোতিতে প্রদীপ্ত! মহাযোগের এই অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাদবচন্দ্রের স্তম্ভিত প্রাণ বলিয়া উঠিল—

"আহা! এ যে মহাদেব!"

ঘ। কুচবিহারবিবাহনিবন্ধনের নীতি।

মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যে না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই, কুচবিহার-বিবাহনিবন্ধনের আন্দোলন তাহার সাক্ষী। এই সম্পর্কে

অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন, কি বলিয়াছেন। কুচবিহারষ্টেটের তৎকালীন মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (যিনি এই বিবাহের "ঘটক" এবং প্রধান পরিচালক ছিলেন) যে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উপরে বিবৃত হইয়াছে। নববিধানের প্রেরিত সত্যব্রত "মৌলানা" গিরীশচন্দ্র সমস্ত ব্যাপার নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা "স্মৃতিলিপি" রূপে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবাহের পাত্রী সুনীতি দেবী নিজে পরিণত বয়সে তাঁহার Autobiography of An Indian Princess" গ্রন্থে সরল ভাষায় এই ঘটনার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বোপরি পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত প্রশান্ত-কুমার সেন "Keshub Chunder Sen And The Cooch Behar Betrothal" নাম দিয়া এই মাত্র যে একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন, document এর হিসাবে তাহার মূল্য খুব বেশী। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কোন ধার ধারেন না তাঁহাদের মধ্যেও অনেক গণ্যমান্য লোক সত্যের খাতিরে শ্রীকেশবের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমি নিজে কিছু না বলিয়া এক দিকে পাশ্চাত্য জগৎ, এবং অন্য দিকে বিংশ শতাব্দীর নবজাগরিত ভারত, "কুচবিহার বিবাহ" ব্যাপার কি চক্ষে দর্শন করে তাহাই আভাসে প্রকাশ করিব।

১। পাশ্চাত্য জগতের অভিমত।

সর্ব্বপ্রথমে সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়াদেবীর কথা বলা যাক্। ঋষি গৌরগোবিন্দ তাঁহার "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেক্রেটারীদ্বারা কেশবচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন, ইহা আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আশ্চর্য্যের বিষয় মনে না হইলেও তাঁহার মত ধর্ম্মনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণা, সতী নারীর এ কার্য্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যে স্থলে ধর্ম্ম ও নীতির সহিত বিরোধ সেস্থলে কোন প্রকারে তাঁহার যে কেহ অনুমোদন পাইবেন সাধ্য কি?"

লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র প্রভৃতি সুবিখ্যাত ইংরাজমহোদয়গণ "কুচবিহারবিবাহনিবন্ধন" সম্পর্কে শ্রীকেশবের কার্য্যকে শুধু যে পূর্ণ হৃদয়ে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এ কথাও অতি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে কেশবচন্দ্র যদি এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষা না করিতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই গুরুতররূপে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতেন।

লণ্ডনের সর্ব্বজনপরিচিত একেশ্বরবাদী ভয়েসী সাহেব

সাধারণতঃ শ্রীকেশবের অনেক কথাতেই সায় দিতে পারিতেন না. কোন কোন সময়ে প্রতিবাদের উদ্দেশে সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ; কিন্তু তিনিও এই অনুষ্ঠানকে এমন তেজের সহিত সমর্থন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ বিস্ময়রসে পূর্ণ হয়। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই ভাবে "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত হইয়াছিল—

"ইংলণ্ডস্থ খ্রিষ্টসমাজের আচার্য্য রেভেরেণ্ড চারল্‌স ভয়েসী সাহেব আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে, পত্র পাঠে বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। যিনি এইরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দুরভিসন্ধি দোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার বিশ্বাস এই, আচার্য্য মহাশয় এই বিবাহ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল যে মহৎ এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা নহে, কিন্তু উহা অনিবার্য্য এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য। ভয়েসী সাহেব ইহাও বলেন যে, এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার এই আশা যে ক্রমে সকল দিক্ পরিষ্কার হইবে, এবং নিন্দা গ্লানি পরিণামে কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আচার্য্য মহাশয়ের মনে যথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি

আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই আন্দোলন তাঁহার মতে ঈর্ষামূলক।"

বিদুষী মিস্ কব প্রতীচীর একজন চিহ্নিত প্রতিনিধি। তাঁহার নাম সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই পরিচিত। তিনি শ্রীকেশবের মহাপ্রস্থানের প্রায় ২৫ বৎসর পরে (১৯০৮ খৃষ্টাব্দে) কুচবিহারবিবাহনিবন্ধনের নীতি সম্পর্কে "East & West" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন আর উপায় নাই। বোম্বাই মহানগরীর বিখ্যাত "সুবোধ পত্রিকা" মিস্ কবের এই সাক্ষ্যের সারাংশ সহ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মাঝে মাঝে বাদ দিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"Miss Frances Power Cobbe's article on Keshub Chunder Sen and the publication of some of the letters that she received from him will remind our too-forgetful countrymen of the great and pure soul that ended its holy mission in this world some twentyfive years ago......Except by a few notable persons neither the man nor his mission has in any way been adequately appreciated. Yet to those educated Indians who are spiritually inclined there is

not a career in modern Indian History that can be more inspiring and enthralling.…Indeed, Brahmananda Keshub's career is one of the mightiest hidden resources of this country.……

"The main interest of the article, however, lies in the explanation offered, of the one act of Keshub's life which has been a stumbling-block to many of his admirers. Miss Cobbe says that the Kuch Behar Marriage is one more notable instance in history of the ethical error that gives social duty preference before personal duty; in other words, it is a result of the mistake of thinking, 'that it is possible for us to do good in any more effectual way than by being good to the summit of our moral ideal.' It is, indeed, an interpretation worthy of the unselfish and elevated life and character of Keshub Chunder Sen. Though pre-eminently a man of prayer, the deep moral life of Keshub felt forcibly the conflict in which personal and social claims meet in the higher region of ethics. A man can not serve

two masters. Whether to obey the light in us or conceding a little to the weakness of our brethern help them to see the light, has perplexed many a noble soul. ......To the man who sees deep, and has mastered the very mysteries of life, faithfulness to God and service to man mingle into one harmonious self-dedication. The whole question then reduces itself to this :—Has Keshub Chunder Sen in serving his brethern always stood up to the full height of his moral stature ? a perusal of the letters published puts it beyond doubt that he did. If, therefore, as he says in one of his letters, conscience acquitted him none can convict him."— Subodh Patrica, Bombay.

২। নব্যভারতের অভিমত।

কালের মাহাত্ম্যে কেশবজীবন সম্পর্কে প্রতীচির ন্যায় প্রাচ্যেরও দিব্য চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারবিবাহের বাগ্দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তাহার পরে একটীর পর একটী করিয়া ৪৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই বিবাহের যিনি পাত্রী সেই স্বনামধন্যা সুনীতি দেবীও কয়েক দিন হইল অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এখন আর সেই নিন্দা গঞ্জনা হিংসা দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। নবজাগরিত দেশ এখন লোকের কথায় না ভুলিয়া স্বাধীনভাবে যাহা সত্য তাহাই ধরিতে চায়। নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকেশবের জীবনরহস্য এখন একটু একটু করিয়া উদঘাটিত হইতেছে; নব্যভারত এখন তাঁহাকে নবযুগের Prophet রূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। ইহা যে কল্পনা নহে কিন্তু খাটী সত্য তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ নানা ভাবেই পাওয়া যাইতেছে।

"কুচবিহারবিবাহ" যে ঈশ্বরকৃত একটী মঙ্গলবিধি, এবং এই অনুষ্ঠানের ভিতর যে শ্রীকেশবের ধর্ম্ম ও নীতি অসম্ভাবিত-রূপে জয়যুক্ত হইয়াছে, তাহা দেশের অনেকেই এখন অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মহারাণী সুনীতি দেবীর মহাপ্রস্থান উপলক্ষে ভারতের বিখ্যাত দৈনিক "Liberty" যাহা বলিয়াছেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—

"The death of Maharani Sunity Devi takes the memory back to the early seventies when Bengal, and the Brahmo Somaj in particular, was convulsed with controversy over her betroth-

al to the young Maharajah of Cooch Behar. The Maharajah was then sixteen and Sunity Devi, the eldest daughter of Keshub Chunder Sen all but fourteen. The Government of Bengal was determined to find a suitable partner in life for the young Maharajah, and who could be more suitable than the accomplished daughter of Keshub Chunder Sen? Keshub, however, did not at first entertain the idea. Then came the next move of the Government—for giving the Maharajah the advantage of education abroad; they wanted to send him to England. The Maharani-mother protested. Surely, the boy was not to be sent to England to come back later with a foreigner as the future Maharani of Cooch Behar! This opposition set the Government to renew their efforts for bringing about the alliance with Keshub's daughter. It was distinctly understood that it was truly to do duty for a betrothal, the Maharajah leaving for England immediately after it, and the proper marriage to be solemnised when the parties were of

age. Keshub agreed to it on the distinct footing that it was to be morally and in fact a betrothal.

But other differences which were fundamental concerning doctrines and religious disciplines had already been at work in causing a split in the Brahmo Somaj, and the Cooch Behar betrothal was got hold of as the peg on which to hang them. Indeed, for sometime it was popularly believed that the Cooch Behar betrothal was responsible for the schism in the Brahmo Somaj. It is refreshing to see that with the progress of years things are being seen in their true perspective; the animosities of the seventies are subsiding and the distinguished Brahmo leader being restored to the reverence and gratitude to which he is entitled."

আরও একটী দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারীদেবীর নাম ভারতের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত; তিনি কুচবিহারবিবাহনিবন্ধন সম্পর্কে শ্রীকেশবকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

"বাস্তবিকই! কুচবিহারবিবাহে তাঁহার [কেশবচন্দ্রের] দলের মধ্যে কেন যে ঐরূপ হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল তাহা

বুঝা যায় না। বিবাহে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান কিছু থাকিবে না, গভর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ কথা লইয়াই তিনি ইহাতে সম্মত হন। এবং শক্রব্যূহপরিবেষ্টিত হইয়া নানারূপ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও নিজ মতে অটল থাকিয়া তিনি কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহান্তে রাজান্তঃপুরে যাহা কিছু পৌত্তলিক আচার হইয়াছিল সে জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। কন্যার মঙ্গলকামনা পিতার একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেশবচন্দ্র এই বিবাহে কেবল যে পিতৃধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু কুচবিহারের ন্যায় রক্ষণশীল দেশে সত্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়া বিধাতার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

"দ্বিতীয়তঃ—বরকন্যা তখনও বিবাহবিধিনির্দ্দিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই—কেশবচন্দ্রের প্রতি বিপক্ষদলের এই যে অভিযোগ তাহাও এখানে খাটে না। কারণ বিবাহের পরই রাজা বিলাত চলিয়া যান ও কয়েক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে পর তবে বরকন্যার প্রকৃত মিলন ঘটে। অতএব কোন দিক্ হইতেই কেশবচন্দ্র কুচবিহারবিবাহে তাঁহার ধর্ম্মমতবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই।"— সাহিত্য-স্রোত, ১ম ভাগ—২৭০ পৃষ্ঠা। (১৯৩২)

৬। বিশ্বাসের দুর্জ্জয় বল।

("কাঙ্গাল আর বাঙ্গাল")

ভক্ত বঙ্গচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি যে মঙ্গলময়ের বিশেষ বিধানে "কুচবিহারবিবাহের" বাগদান অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইয়া গেলে যখন বিরোধীদল শ্রীকেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি স্থির শান্তভাবে বলিয়াছিলেন,—

"ধনী, মানী, জ্ঞানী কেহই আর আমার কাছে রহিল না, রহিল কেবল কয়টী কাঙ্গাল আর বাঙ্গাল। আমি ইহাদিগকে নিয়াই সংসার জয় করিব।"

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার এই প্রভু-সর্ব্বস্ব সেবকটীর মনস্কামনা কি অদ্ভুত ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য চিরকাল প্রদান করিবে।

বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মতেজে পূর্ণ তিনি যে শুধু কয়টা "কাঙ্গাল আর বাঙ্গালকে" নিয়া সংসার জয় করিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অভয়চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ যাঁহার জীবনের আরম্ভ ও শেষ, সংসারের ভীষণ ঝড় তুফান তাঁহার আর কি করিবে?

দশম অধ্যায়।

বিশ্বাস শান্ত ও উদার।

(কয়েকটী দৃষ্টান্ত)

শ্রীকেশব বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও স্বভাবতঃ "শান্ত" রসের আধার ছিলেন। এক দিকে পুণ্যের অগ্নি, অন্য দিকে প্রেমের জল, এই দুই স্বর্গীয় বস্তুর মিলনে তাঁহার জীবনে মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। বিশ্বাস এই মিলনের মূল ভূমি। বাস্তবিকই বিশ্বাস তাঁহাকে পুণ্যের আগুনের ভিতর দিয়া প্রেমের এক উদার প্রশান্ত ভাবের ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার বিবেকী প্রাণ পাপতাপের ভ্রূকুটী দেখিলেই আগুন হইয়া জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু পাপীতাপীর দুঃখে তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয় একেবারে গলিয়া যাইত; তাহাদের মুক্তির জন্য তিনি ঊর্দ্ধ-মুখে অশ্রুপূর্ণলোচনে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। পাপীতাপীকে তিনি কেমন করিয়া ঘৃণা করিবেন? মহা অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই যে ঈশ্বরের সন্তান। করুণাময় হরি তাঁহাদিগকেও অমৃতের অধিকারী করিয়া কতই আদরে আপনার পুণ্য-বক্ষে স্থান দিয়াছেন! শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট বিশ্বাস কেবল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-দর্শন নহে; ইহা ব্রহ্ম-বক্ষে ব্রহ্ম-সন্তানকেও প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেয়। মহানরকের ভিতরে যুগযুগান্ত ডুবিয়া

থাকিলেও মানবের ঈশ্বর-সন্তানত্ব মুছিয়া যায় না, বিশ্বাসাত্মা পুরুষ তাঁহাকে শম, দম ও ক্ষমার চক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিবেন? কেশব-জীবন হইতে এই শম, দম ও ক্ষমার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকাশ করা গেল।—

১। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীকেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সত্য-রাজ্য বিস্তারের জন্য যখন মাদ্রাজ মহানগরীতে গমন করেন তখন সেখানে কিরূপ ধর্ম্মান্দোলনের মহা ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি এমনই তেজের সহিত অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিলেন যে তাহাতে স্থানীয় অনেক গোড়া হিন্দুর প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেহ কেহ ধর্ম্মাভিমানে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়। তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে "Thunderbolt of Bengal" এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি বহুজনাকীর্ণ কোন সভাতে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত উপদেশ প্রদান করেন। যখন তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন তখন জনৈক ক্রোধান্ধ হিন্দুযুবক সহসা সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিল। যুবকের আচরণে শ্রীকেশব বড়ই ব্যথিত হইলেন; তাঁহার হৃদয় করুণারসে পূর্ণ হইল। তিনি ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইলেন এবং প্রশান্ত নয়নে তাহার মুখপানে তাকাইয়া

মধুর স্বরে বলিলেনঃ—"God bless you!" যুবকটীর প্রাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে গলিয়া গেল; সে অনুতপ্ত প্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে প্রস্থান করিল। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী তখন নীরব নিশ্চল। (সাক্ষী-ভাই উমানাথ গুপ্ত)

২। কুচবিহারবিবাহনিবন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে পর শ্রীকেশবচন্দ্রের যে সকল শিষ্য নানা প্রকার সাংসারিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহাদের মধ্যে কোন একটী বীরপুরুষ একবার এক টুকরা দড়ী খামের ভিতরে ভরিয়া ডাকযোগে তাঁহার নিকটে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দেন যে "এই দড়ী গলায় দিয়ে তুমি এখন মর!" শ্রীকেশব পত্রখানা ও দড়ী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ—"এই দেখ ভালবাসার কেমন চমৎকার উপহার! লোকটীর হস্তাক্ষর কিন্তু বড়ই সুন্দর!" (সাক্ষী—ভাই দর্গানাথ রায়)

৩। এক দিন পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটী ভদ্রলোক শ্রীকেশবের কাছে আসিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন যে অমুক ব্যক্তি দিনরাত্রই আপনার বড় নিন্দা করেন। ব্রহ্মানন্দ দেব মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'তিনি আমার ভিতরে দোষ দেখ্‌তে পাচ্ছেন, তা বল্‌বেনা?" ভদ্রলোকটী তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। (সাক্ষী—ভাই মহিমচন্দ্র সেন)

৪। ব্রাহ্মসমাজের কোন একটী পদস্থ ব্যক্তি শ্রীকেশবচন্দ্রের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রতিভা ও দেশের সর্ব্বত্র মহাপ্রতিপত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইতেন। "হউনই বা তিনি ধর্ম্ম-নেতা, পদ-গৌরবের এত বাড়াবাড়ি কেন? ক্ষমতালাভের জন্যই বা এত আকাঙ্ক্ষা কেন? সমস্তেরই একটা সীমা আছে।"—এই জাতীয় কুচিন্তার তাড়নায় লোকটী যারপরনাই অশান্তি ভোগ করিতেন, এবং কেমন করিয়া কেশবচন্দ্রকে জব্দ করা যায় তাহাই ভাবিতেন। অবশেষে এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী হঠাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলে তিনি সকলের নিষেধ সত্বেও ব্রহ্মানন্দদেবকে অতিক্রম করিয়া অন্য কাহারও কাহারও সাহায্যে স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন; তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করা হইল না! কিন্তু আত্মজিৎ শ্রীকেশবচন্দ্র তবুও প্রসন্ন মনে ঠিক সময়ে শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা দিয়া নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন। উদারতার এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া গৃহস্বামীর হৃদয় গলিয়া গেল। যাঁহাকে তিনি বড্ড অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিতেন তিনি বিনাআহ্বানে তাহার দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত! দীনতা ও আত্মত্যাগ আর কাহাকে বলে? কিছুদিন পরে কর্ম্মকর্ত্তা অনুতপ্ত প্রাণে কলুটোলার ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিলেন,

"আমি একজন মহা অপরাধীর ন্যায় এখানে আসিলাম!" সমন্বয়াচার্য্যদেব এই হারা-বন্ধুটীকে পাইয়া অতি আদরে নিজের বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। ধরাতলে তখন স্বর্গ অবতীর্ণ হইল! (সাক্ষী—সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ।

৫। বিরোধিগণ যখন শ্রীকেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময়ে একদিন তাঁহাদের কয়েকজন দল বাঁধিয়া অর্থ ভিক্ষার জন্য সমন্বয়াচার্য্যদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শুধু চাঁদা সংগ্রহ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; শ্রীকেশবের প্রাণের সমতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে ক্রোধের বশীভূত করাই এই সাম্যবাদীদের প্রধান মৎলব ছিল। কিন্তু তিনি কোন জগতের অধিবাসী তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা চাঁদার খাতা হস্তে করিয়া একটু অপ্রস্তুত ভাবেই ভক্ত-প্রবরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মানন্দদেব শান্তমনে সেই খাতাখানা হাতে নিলেন, এবং দশ টাকা দান করিয়া চাঁদার ঘরে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলেন, "সত্যমেব জয়তে!" শত্রুগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। (সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

৬। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে কতকগুলি দুষ্ট লোক শ্রীকেশবচন্দ্রকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকারের জঘন্য গ্লানি প্রচার করে। ইহাদের অগ্রণী ছিলেন

ব্রাহ্মসমাজের একটী গণ্যমান্য লোক ; তিনি অসদুপায়ে নিজের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া শত্রুতাসাধনের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে ব্রহ্মানন্দদেবের সহিত তাঁহার মিলন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ধন্য এই বিশ্বাসাত্মা পুরুষের উদারতা ও নির্ব্বিকার ভাব। পাষণ্ডের দল তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্রের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়া লজ্জিত মনে একে একে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

উপরোক্ত ব্রাহ্মমহোদয় সম্পর্কে এখানেই যবনিকা পতন হইল না। কালের বিচিত্র গতিতে তাঁহার এই রূপ শোচনীয় দৈন্য উপস্থিত হইল যে তিনি ক্ষুধার সময় তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মুখে যে দুটী অন্ন তুলিয়া দিবেন এমন সামর্থ্যও রহিল না। শ্রীকেশবচন্দ্র এই দুরবস্থার কথা শুনিবামাত্র বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পরে তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই এই উপায়হীন পরিবারের সাহায্য করিতেন। ঘোর শত্রু পরম মিত্ররূপে ফিরিয়া আসিল ; বিশ্বাসের জয় হইল। (সাক্ষী—সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ)

৭। বিশ্বাস শ্রীকেশবচন্দ্রকে এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর নিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি মহাপাপীর ভিতরেও অমৃতের অধিকারী ঈশ্বর-সন্তানকে দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়ে স্থান দান করিতেন ; সংসারের ঘোর শত্রুও পরম মিত্ররূপে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইত। তিনি শত্রুগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"শত্রুগণ শত্রুতা করিয়া কি করিতে পারে? এই পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শত্রুর ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটী কটু কথা সহ্য করিলে সেই কটু কথা আশীর্ব্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে।"

(১২ই চৈত্র, ১৮০০ শক)

তিনি শত্রুগণের শত্রুতাচরণকে কি চক্ষে দেখিতেন, এবং কেনইবা দেখিতেন, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"দেখ, বিরোধের ভিতর কেমন চমৎকার রত্ন, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব্ব সুখসম্পদ। বিরোধ পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অল্প সময়ের জন্য, কেননা ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।......প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্যভাবে চারিদিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতি কেমন জ্বলন্তভাবে প্রকাশিত! কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে, দেখ ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা!" (১২ই চৈত্র, ১৮০০ শক)

নববিধান-বিরোধী ব্রাহ্মগণ যখন ক্রোধ ও বিদ্বেষে আত্মহারা হইয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে অমানুষিক ভাবে অপমানিত ও পদদলিত করিতেছিলেন তখন তাঁহার রক্তাক্ত হৃদয় হইতে এই অমৃতবাণী নিসৃত হইয়াছিল। বিশ্বাসের এমন জীবন্ত শান্তিঘন মূর্ত্তি আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি?

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বাসের বিচিত্র প্রকাশ।

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান)

১। বিশ্বাসের প্রমাণ।

একদা শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যোগের আদিভূমি হিমাচলে উপাসনান্তে বসিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ দেহ-খানি গৈরিকবসনে আচ্ছাদিত; বদনমণ্ডল কি এক অপার্থিব হাস্য-প্রভায় প্রদীপ্ত; নয়নের দৃষ্টি মধুময়; যোগস্থ প্রাণ ভূমানন্দে মগ্ন। কয়েকটা বিধান-ভক্ত তাঁহার চারিদিকে স্থির ধীর ভাবে নীরবে উপবিষ্ট। সকলেরই দৃষ্টি নবভক্ত-দেবের প্রেম-সুন্দর মুখশ্রীতে নিবদ্ধ। তিনি মধুর স্বরে নবীন ব্রহ্মতত্ত্বকথা বলিতেছেন; আর বিশ্বাসিগণ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহা শুনিতেছেন। এক জন তত্ত্বপিপাসু কথা-প্রসঙ্গে ব্যাকুলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্বাসই যদি ধর্ম্মের মূল হয় তবে সেই বিশ্বাসের প্রমাণ কি?

শ্রীকেশবচন্দ্র গম্ভীর ভাবে সম্মুখস্থ একটী বিশাল কেলু বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ উন্নত তরুর শীরোদেশ হইতে লম্ফপ্রদান করাই প্রকৃত বিশ্বাসের জীবন্ত প্রমাণ।"

শিষ্য কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তবে তো আত্মহত্যা আবশ্যক ; কেননা ঐরূপ স্থলে মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী।"

"কখনও নয়! কখনও নয়!", ব্রহ্মানন্দদেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা নিশ্চয় জানিও যে বিশ্বাসী সন্তান ঐ বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইতে না হইতেই আনন্দময়ী মা তাহাকে আপনাব অমৃত-বক্ষে ধারণ করিয়া লইবেন।" (সাক্ষী—ভাই উমানাথ)

২। বিশ্বাসী ও ভাবুক।

একদিন শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্ত দুঃখের সহিত শ্রীকেশব-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা ভগবৎকৃপায় এক একটী উৎসবে এত পাই তবু প্রাণে কেন জমাট বাঁধে না?" সমন্বয়াচার্য্যদেব একটু হাসিয়া এই ভাবে উত্তর করিলেন,—

"তোমাদের ধর্ম্মভাব সমুদ্রে বান-ডাকার মত মহাতেজে হুঁ হুঁ করিয়া আসে আর অমনি হুঁ হুঁ করিয়া কোথায় চলিয়া যায়; পড়িয়া থাকে শুধু শুষ্ক বালুচর। কিন্তু বিশ্বাসী কি করেন? তিনি সংসার-ক্ষেত্রে দিনরাত্র ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন, আর বিন্দু বিন্দু করিয়া চিদাকাশ হইতে বর্ষিত ব্রহ্মকৃপাবারি সমস্তই তাঁহার উন্মুক্ত হৃদয়ে পরম যত্নে ধারণ করেন ; কালে এই সঞ্চিত জল স্বভাবের প্রেরণায় চির-পূর্ণ উৎসের আকারে

জগতের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য নির্ম্মল ধারায় উৎসারিত হয়।"

ভক্ত উমানাথের বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে যিনি বিশ্বাস-রাজ্যের এই মধুর তত্ত্বকথা বলিতেছিলেন তাঁহার নিজের জীবনটাই অবতীর্ণ ব্রহ্মকরুণার চিরপূর্ণ অমৃত-উৎস।

(সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

৩। রোগের মহৌষধ

বিশ্বাস যে প্রকৃতই রোগের মহৌষধ কেশব-জীবন তাহার প্রমাণ। এই সম্পর্কে এখানে একটী মাত্র ঘটনার বিবরণ "ধর্ম্মতত্ত্ব" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, গৌরনগর, এলাহাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানাস্থান হইতে কতকগুলি ধর্ম্ম-পিপাসু ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উৎসবের পূর্ব্বদিনে আচার্য্য মহাশয় [শ্রীকেশবচন্দ্র] মস্তক-পীড়ায় অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়েন। ইহাতে আমাদের যে প্রকার ক্লেশ এবং দুঃখ হইয়াছিল তদপেক্ষা শতগুণ ক্লেশ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভগ্ন মনে বিষন্ন চিত্তে উক্ত দিবস প্রাতে আমরা উৎসব আরম্ভ করিলাম। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকামণ্ডলীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। প্রাতঃকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পন্ন করেন। তাঁহার

উপদেশ শেষ হইলে হঠাৎ আচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল। আমরা আশ্চর্য্য ও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অনিদ্রা ও ঘোরতর শিরপীড়ায় অস্থির ছিলেন সহসা তাঁহাকে এইরূপে মহাজনতাপূর্ণ উৎসব-মন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার মনে আশঙ্কাও হইল। কিন্তু ভক্তিরাজ্যের কি দুর্ব্বগাহ্য নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! তাহার পর হইতে তিনি স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতার সহিত রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎসবের অবশিষ্ট কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশম হইয়া গেল।”—

“ধর্ম্মতত্ত্ব”, ১৬ই ভাদ্র, ১৭৯৮।

৪। প্রেমচাঁদ ও রূপচাঁদ।

সঙ্গীতাচার্য্য ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীকেশব যখন নবধর্ম্ম প্রচারের জন্য সুদূর ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিলেন তখন একদিন একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"আপনি তো বিলাত যাওয়া ঠিক করিলেন, কিন্তু টাকা কোথায় ?"

শ্রীকেশবচন্দ্র হাস্যমুখে উত্তর করিলেন,—

"প্রেমচাঁদ যখন হাজির হয়েছেন, রূপচাঁদও দেখা দিলেন বলিয়া।"

যিনি একমাত্র ঈশ্বরের মুখপানে তাকাইয়া পূর্ব্বে পাত্র ঠিক না করিয়াই তাঁহার একটী কন্যার বিবাহের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং সেই তারিখেই উপযুক্ত পাত্রের হাতে মহাসমারোহে কন্যাটীকে সমর্পণ করিলেন, তাঁহার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায়। এই বিশ্বাসাত্মা পুরুষই মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে পৃথিবীকে শুনাইয়া গিয়াছেন,—

"কাপড় ছিঁড়িয়া একটী সূতা হাতে করিয়া বল, আয় আয় টাকা আয়। পরদিন সকালে সূর্য্যের মুখ হইতে যত প্রয়োজন, ঈশ্বর দিবেন।"— জীবনবেদ।

প্রকৃত বিশ্বাসের কি অভিনব মূর্ত্তি !

৫। "লোক চাইনা, জীবন চাই।"

একবার শ্রীকেশবচন্দ্রের কোন একটী অনুগত শিষ্য শিক্ষিত সমাজের ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধ মনে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"শিক্ষিত সমাজতো আপনাকে নিল না। চলুন পল্লীগ্রামে

যাই, সেখানে হাজার হাজার লোক আপনাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে।”

ব্রহ্মানন্দদেব হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

“শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে এবং আমাব ধর্ম্মকে গ্রহণ করিবে। আমি যদি এখন গৈরিক পরিয়া ও মাথা মুড়াইয়া খালি পায় ঘুরিয়া বেড়াই আমি নিশ্চয় জানি লক্ষ লক্ষ লোক অমনি আমাকে পূজা করিবে। কিন্তু আমি তাহা কখনও করিব না, কারণ আমি লোক চাইনা, জীবন চাই।”—(ভাই মহেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য)

শ্রীকেশবচন্দ্র যে দেশের লোক সেখানে বিশ্বাসের বলই আসল বল, সংখ্যার বল অসার।

৬। বিশ্বাস ও যুক্তি।

শ্রীকেশবচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, তখন জনৈক শিক্ষিত হিন্দু তাঁহার কোন কোন শিষ্যকে এক দিন বলিয়াছিলেন,—

“কিহে! তোমাদের সমাজের আলো যে তোমাদের ছেড়ে বিলাত চলে গেছেন, তোমরা তো এখন অন্ধকারেই পড়ে থাক্‌বে।”

একটী ব্রাহ্ম সদর্পে জবাব দিলেন,—

“কেন? আমাদের ভিতরে কি আর আলো নাই?

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একটু হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"হা! আমরাও প্রত্যেকেই এক একটী আলো বটে, কিন্তু আতসের মত জ্বলে উঠি আর অমনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই!"

এই কাহিনীটী আমি সঙ্গীতাচার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য-নাথের মুখেই শুনিয়াছিলাম। তিনি সেই যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম যুবককে ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীকেশব ছিলেন ব্রহ্মানুগত বিশ্বাসাত্মা পুরুষ; তাঁহার প্রাণে বিশ্বাসের বিমল আলো নিরন্তর সমান ভাবে জ্বলিত। সংসারের বুদ্ধিজীবী লোক ইহার কি বুঝিবে? বিচারবুদ্ধির আলো এই আছে এই নাই।

৭। "পেগাম্বর" ও বিশ্বাসাত্মা পুরুষ।

শ্রীকেশবচন্দ্র "পেগাম্বর" নহেন। তিনি বিশ্বাসাত্মা পুরুষ, তাই অসাধারণ মানুষ। ধর্ম্মজগতে তিনি সম্পূর্ণ একটী অভিনব শ্রেণীর লোক। তাঁহার "Prayers" নামক ইংরাজী গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে যে এক দিন তিনি নিভৃতে বসিয়া তাঁহার হৃদিস্থিত পরম দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"প্রভো! সংসারে আমি কি নামে পরিচিত হইব? হিন্দুগণ বলেন আমি হিন্দু, মুসলমানগণ মনে করেন আমি মুসলমান, বৌদ্ধগণ আমাকে খাটি বৌদ্ধ বলিয়াই ভালবাসেন

এবং খৃষ্টানগণ প্রচার করিতেছেন যে আমি নিশ্চয়ই খৃষ্টান। তুমি আমাকে দয়া করিয়া বল আমি প্রকৃত পক্ষে কি।"

ভগবান্ প্রত্যাদেশের স্বরে উত্তর করিলেন,—

"বৎস! তুমি হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, বৌদ্ধও নও, খৃষ্টানও নও, ব্রাহ্মও নও; তুমি বিশ্বাসাত্মা পুরুষ [Man of faith]।" অবতীর্ণ ব্রহ্মবাণীরই জয়!

সকলেরই জানা আছে যে "Am I An Inspired Prophet?" এই বিখ্যাত বক্তৃতাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দদেব আপনাকে "পেগাম্বরশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে টাউনহল হইতে কমলকুটীরে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার কয়েকটী বিশ্বস্ত অনুগামী কি যেন মনে করিয়া একে একে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। কেশবচন্দ্র নিঃশব্দে সকলের মুখপানে তাকাইয়া প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা সহজে বুঝিতে পারিলেন এবং একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কিগো, তোমাদের কি বিশ্বাস? আমি কি পেগাম্বর?"

একজন শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—

"হাঁ! আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি প্রকৃতপক্ষে তাই, কিন্তু অসাধারণ বিনয়ী বলিয়াই নিজকে সেই শ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন,—

"তোমরা কেহ কি বিশ্বাস কর যে কোন পেগাম্বর মিথ্যা কথা বলিতে পারেন ?"

উত্তর হইল, "না"।

তখন তিনি মধুর স্বরে বলিলেন,—

"আজ টাউনহলে যাহা প্রচার করিলাম তাহা যদি সত্য হয় তবে আমি পেগাম্বর নই, এবং যদি মিথ্যা হয় তবেও আমি সে শ্রেণীর বাহিরে, কারণ তোমরাই বলিলে যে পেগাম্বর যিনি তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না।"

[সাক্ষী—ঋষি গৌরগোবিন্দ]

৮। বিশ্বাসের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি।

শ্রীকেশবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র যখন নিতান্ত শিশু তখন তিনি কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। সমন্বয়াচার্য্যদেব তৎকালে বেলঘরিয়া তপোবনে শিষ্যগণের সহিত নির্জ্জনসাধনে নিরত ছিলেন। শিশুটীর অসুখ যখন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল তখন এই সংবাদ কেশবচন্দ্রকে দিতে হইল। বিশ্বাসাত্মা পুরুষ পুত্রধনের শঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে উদ্যান হইতে একটী সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল তুলিয়া অনতিবিলম্বে নিজালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তখন একেবারে অচৈতন্য। ভক্তপ্রবর নীরবে কাছে

আসিয়া যোগমগ্ন প্রাণে সেই সুন্দর ফুলটী তাহার ক্ষুদ্র মস্তকে স্থাপন করিবা মাত্রই অজ্ঞানিত যাদুমন্ত্রবলে শিশু চক্ষুদুটী খুলিয়া পিতার মুখপানে তাকাইলেন এবং আনন্দে হাসিতে লাগিলেন! যাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কি যে মহৌষধ ঐ ফুলটীর ভিতরে ছিল তাহা শুধু ভক্ত এবং তাঁহার ভগবান্ই জানিতেন। বিশ্বাসের ক্রিয়া আলৌকিকই বটে!

(সাক্ষী—মহারাণী সুনীতি দেবী)

৯। "কম্টী" ও "বেশীটী"।

(বিজ্ঞান ও বিশ্বাস)

কোন এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত কম্টীর গ্রন্থ খুব আদরের সহিত পাঠ করিতেন। শ্রীকেশবচন্দ্রকে এই দলের বহির্ভূত দেখিয়া তাঁহার একজন বিজ্ঞ শিষ্য এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সকলেই দেখ্ছি "কম্টীকে" নিয়া পাগল, শুধু আপনি কেন বাদ পড়িলেন?"

ব্রহ্মানন্দদেব হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বেশীটী যখন পেয়েছি, তখন কমটী নিয়া থাকি কেন?"

বিশ্বাস যে সাধকের নিকটে দর্শন বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

তাহা শ্রীকেশবের এই উক্তি হই প্রতিপন্ন কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি বরাবরই বিজ্ঞানকে সত্যের অভ্রান্ত সাক্ষীরূপে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। বিশ্বাস যে স্বর্গের খাটী জিনিষ বিজ্ঞান তাহার প্রমাণ। তিনি কতবারই দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত না হইলে কেহ যেন কখনও তাহা গ্রহণ না করেন। [সাক্ষী—ভাই বঙ্গচন্দ্র]

১০। ঈশ্বরের কথাই শুনিবে।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন এক দিন শ্রীকেশবকে বলিলেন,— "আমি অত শত বুঝিনা, আপনি যা বল্‌বেন আমি তাই কর্‌বো।"

বিশ্বাসাত্মা পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন, ঠিক বল্‌ছ ? আমি যা বল্‌বো তাই কর্‌বে তো ?

বার বার তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, এবং প্রতিবারই ভাই প্রসন্নকুমার উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাই কর্‌বো।" তদুত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন,—

"আমি বল্‌ছি আমার কথা শুনোনা, ঈশ্বরের কথাই শুন্‌বে !" (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল)

১১। ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলের উপর।

শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ এক দিন শ্রীকেশবকে বলিলেন,—

আপনিতো সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিশু হইতে অনুরোধ করিতেছেন আচ্ছা, আমরা তবে শিশু হব, কিন্তু আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে প্রত্যেক শিশুই তার মার অবাধ্য হয়।"

শ্রীকেশব হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"বেশতো, ঈশ্বর যদি তোমাদের অবাধ্য হইতে বলেন তবে তাহাই হইও।" (সাক্ষী—ভাই উমানাথ)

১২। একজনেই সব।

পূর্ব্ববঙ্গ নববিধানমণ্ডলীর উপাচার্য্য ভক্ত বঙ্গচন্দ্র প্রায় প্রত্যেক বৎসরই মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে গমন করিতেন। কেশব-যুগে কলিকাতার মাঘোৎসব যে কি বিরাট্ ব্যাপার ছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তখন ধরাতলে যেন স্বর্গ অবতীর্ণ হইত! উপাসনা, ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন, ধ্যানধারণা, শাস্ত্রপাঠ, সদালাপ, বক্তৃতা, আনন্দ-বাজার, সাধুসেবা, আরও কত কিছু দিনের পর দিন সমান ভাবে বৈকুণ্ঠের অমৃতধারা প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত করিয়া চলিতে থাকিত। এই মহোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতের নানা স্থান হইতে বিপুল জনতার সমাগম হইত।

এই ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গচন্দ্র এক দিন প্রভাতে ব্রাহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকেশবচন্দ্র তখন বেদীতে

আসীন হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলেন। সমস্ত মন্দির নরনারীতে পূর্ণ; বাহিরেও লোক ধরেনা। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ; তাঁহারা কোন্ রহস্তময় অতীন্দ্রিয় লোকে বসিয়া ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ভূমানন্দরস পান করিতেছেন! সমস্তই যেন স্বপ্নের ব্যাপার! এই ভাবে পবিত্র ব্রহ্ম-পূজা সেই বেলার জন্য শেষ হইল, এবং এত যে লোকের ভিড় হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই স্নানাহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য দেখিতে দেখিতে কে কোথায় চলিয়া গেলেন; মন্দিরে রহিলেন মাত্র প্রেম-বিহ্বল বঙ্গচন্দ্র। কিন্তু কতক্ষণ আর তিনি এই ভাবে একাকী বসিয়া থাকিবেন? অবিলম্বে মধ্যাহ্ন-উপাসনার ঘণ্টা পড়িল, এবং ঠিক সময়ে শ্রীকেশবচন্দ্র আসিয়া বঙ্গচন্দ্রের কাছে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা দুই জন ভিন্ন আর কেহই মন্দিরে উপস্থিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মানন্দদেব হাসিতে হাসিতে বঙ্গচন্দ্রকে বলিলেন,—

"তবে তুমিই উপাসনা আরম্ভ কর; তোমার তো খালি বেঞ্চের সাম্‌নে এই কাজ করার অভ্যাস আছে!" বঙ্গচন্দ্র একটু রঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি থাকিবেন তো?"

কেশবচন্দ্র মধুরস্বরে উত্তর করিলেন,—"সে ভয় তুমি করিওনা। আমার যাবার আর স্থান কোথায়?"

বঙ্গচন্দ্র তখন ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে আর লোকের অভাব কোথায়?"

বঙ্গচন্দ্র পূর্ণ প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে এক কেশবচন্দ্রকে

পাইলেই সকলকে পাওয়া হয়। বিশ্বাস-রাজ্যে মহাভাবের কি অদ্ভুত প্রকাশ!

এখানে বলা বাহুল্য যে বঙ্গচন্দ্রই শ্রীকেশবের অনুরোধ মত মধ্যাহ্নের উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। উপাসকগণও আবার দলে দলে আসিয়া পূজায় যোগদান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দির আবার লোকে ভরিয়া গেল। বঙ্গচন্দ্র সে দিন বিশেষ ভাবে ভক্তসঙ্গে ভগবানের অবতরণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (সাক্ষী—ভাই বঙ্গচন্দ্র)

এখানে একটী ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। একবার উৎসবের সময় রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করা হইয়াছে শুনিয়া সমন্বয়াচার্য্যদেব তাঁহার কোন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইলে তেত্রিশকোটীকে গ্রহণ করা আবশ্যক। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। যিনি নববিধানের গুণে অখণ্ড মানবমণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া নিত্যকাল ব্রহ্মবক্ষে স্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে গেলে স্বভাবতঃই সঙ্গে সঙ্গে নিখিল মানবজাতিও আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। ঐ শুন ব্রহ্মানন্দদেব আপনার স্থিতি সম্পর্কে কি বলিতেছেন,—

"Where is my God? In me. Where am I? In my God."

আবার তিনি বলিতেছেন,—

"Where is Humanity ? In me. Where am I ? In Humanity."—Behold The Light Of Heaven In India.

শ্রীকেশব বিশ্বাসের পথে চলিতে চলিতে যখন এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর আসিয়া পড়িলেন, তখনই তাঁহার অন্তর হইতে এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল।

বাস্তবিকই কেশব-জীবনে বিশ্বাসের পরিণতি প্রেম ; তাই তিনি জগৎকে শুনাইলেন,—

"The maturity of faith is love ; for love completeth the union which faith beginneth."—

True Faith.

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

প্রেম-লীলা

"হে প্রিয় পরমেশ্বর, ভালবাসার ক্ষমতা দেও। তুমি হও ফুলের মধু।...মন প্রেমে উথলিয়া উঠুক। পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসিব। প্রাণটা প্রেমে ডুবাও।... বৃন্দাবনে তোমাকে লইয়া খেলা করিব। তুমি কৃপা করিয়া কমলকুটীরে তোমার প্রেমের লীলা দেখাও।"—

দৈনিক প্রার্থনা (২১।১১।৮১)

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ।

"প্রেম" বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার কোন সংজ্ঞা নাই। ইহা এক নিত্য-ক্রিয়াশীল মহাশক্তি। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ যিনি তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা হইতেই ইহার উদ্ভব। বিশ্বাসে ইহার আরম্ভ, নির্ম্মলা ভক্তিতে ইহার পরিণতি। কি জড়, কি অজড়, সমস্তের উপরই ইহার অপ্রতিহত প্রভাব।

প্রেমের স্বভাব চারিদিক্ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু সকল

আকর্ষণ করিয়া আনিয়া সামঞ্জস্য ও মিলনের যাদুমন্ত্রবলে এক করা। ইহার মূর্ত্তি সৌম্য, প্রসন্ন ও করুণাময়। যে ইহা দেখে সে বলিয়া উঠে,—

"আমি তোমার! তুমি আমার!"

ক। শৈশবে প্রেমের আভাস।

বর্ত্তমান যুগে এই দুর্লভ প্রেমের প্রধান লীলা-ভূমি কেশব-জীবন। ইহা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ শৈশব হইতেই নানা ভাবে নানা আকারে পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ বাল্য-জীবনের কথা একটু বলা যাক্।

১। শিশু কেশব সকলের সম্পর্কেই একটী বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিলেন। তাঁহার কচি দেহখানি, তাঁহার মনটী, তাঁহার আচরণ সমস্তই কি এক সুমিষ্ট চিত্তহর দেবভাবে পূর্ণ ছিল। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সে অজ্ঞাত-ভাবে তাঁহার হইয়া যাইত। তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কেহই থাকিতে পারিত না।

তিনি সেন-পরিবারের প্রত্যেকেরই "নয়ন পুতলী" ছিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ সুবিখ্যাত রামকমল সেন ইহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই গভীর ভালবাসা কত ভাবেই প্রকাশ পাইত! এক দিন তিনি শিশু কেশবকে কোলে করিয়া দর্পণের কাছে দাঁড়াইলেন, এবং কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন,—

"তুই সুন্দর, কি আমি সুন্দর? তুইই সুন্দর!" তিনি কত বারই তাঁহার প্রাণাধিক পৌত্রটীকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন—

"তুইই সুন্দর!"

"ও আমার নাম রাখ্‌বে, আমার গদিতে বস্‌বে।"

২। বাসুদেব নামক একটী লোকের উপর শিশু কেশবকে দেখিবার শুনিবার ভার ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই এই ভৃত্য শিশুর মোহিনী মায়ায় এতদূর আবদ্ধ হইয়া পড়িল যে এক মুহূর্ত্তকালও তাহার "গোঁসাইকে" ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সর্ব্বদাই বাসুদেবের বুকে বুকে থাকিতেন বলিয়া শিশু কেশবের এক নূতন নাম হইয়াছিল,—"বেসো।"

"বেসো"

৩। বালক কেশবচন্দ্র তাঁহার ছোট ভাইবোনদিগকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। মাতা সারদা দেবী যখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন তখন তিনি কেশবের তত্ত্বাবধানেই ইহাদিগকে রাখিয়া দিতেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে কেশব ভাইবোনদের সঙ্গে দ্বিতল গৃহে মনের সুখে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী চোর কেমন করিয়া একেবারে উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত! কেশব তখন এক বিন্দু বালক, বিপদ আপদ কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না। তিনি চোরকে দেখিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?" চোর নীরব নিশ্চল ভাবে কতক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থান

তস্কর ও শ্রীকেশব

হইতে প্রস্থান করিল! দুর্দ্দান্ত তস্কর ক্ষুদ্র একটী বালকের ভিতরে কি যে আলৌকিক ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল তাহা কে বলিবে?

৪। কেশবচন্দ্রের চিত্ত স্বভাবতঃই দীনদুঃখীর পানে ধাবিত হইত। চুম্বকের গতি যেমন লৌহের দিকে, জলের গতি যেমন নিম্নদিকে, তাঁহার প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের গতিও সেইরূপ শৈশব হইতেই দুঃস্থজনের দিকে সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর মাত্র তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র একবার নিয়ম করিয়াছিলেন যে পরিবারের প্রত্যেককেই কোন একটী কাজের ভাব লইতে হইবে। সকলেই এই নিয়মের অধীন হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য দায়ী হইলেন। স্থির হইল কেহ ভাণ্ডার দেখিবেন, কেহ জমা খরচ লিখিবেন, কেহ ভৃত্যগণকে খাটাইবেন ইত্যাদি। নবীনচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি কাজের ভার নিবি রে?" পরদুঃখ-কাতর বালক আগ্রহের সহিত উত্তর করিলেন,—

গরীবের বন্ধু

"আমি গরীবদের চাউল ভিক্ষা দেব।"

৫। শ্রীকেশবচন্দ্র কোন দিনই কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া কাহাকেও কষ্ট দিতে পারেন নাই। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—এই মহাজনবাক্যের সার্থকতা তাঁহার বাল্য-

"প্রিয়ং ব্রূয়াৎ"

জীবনেও অনেকবার দেখা গিয়াছে। এখানে একটীমাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। তিনি যখন গরিফার স্কুলে পড়িতেন তখন একদিন তাঁহার মাতামহী কয়েকটী আত্মীয়কে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজেই রন্ধন করিতে বসিয়া গেলেন। বালক কেশবকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন, তাই বলিলেন, "বেসো, আমার রান্না বান্না কেমন হয় তোর একটু চেকে দেখ্‌তে হবে।" কেশব দিদিমার এই আদেশ মত কয়েকটী পদের আস্বাদ নিয়া বলিলেন, "বেশ ভাল হয়েছে।" তারপর স্কুলে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে কেশব স্কুল হইতে ফিরিয়া আসা মাত্রই মাতামহী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন. "হ্যারে বেসো, শুক্তানিতে যে নূণ দেই নাই তাতো তুই বলিস্ নাই ?" আদরের "বেসো" কোন উত্তরই না দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন! মাতামহী একজন পাকা রাঁধুনী, অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিতে এই সদাশয় বালক একেবারেই নারাজ।

খ। জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ।

সর্ব্বজনবিদিতা ভগ্নী নিবেদিতা বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে ভারতে দলবদ্ধভাবে দেশের সেবা করিবার পদ্ধতি শ্রীকেশবচন্দ্রই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি ভগবৎপ্রেমের যাদুমন্ত্রবলে নিজের জীবন ও চরিত্রে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম ও

সমস্ত জাতির সমন্বয় সাধন করিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন যে ঈশ্বর যেমন এক, সেইরূপ ধর্ম্মও এক এবং মনুষ্যও এক, তিনি যে নরনারীর সেবার জন্য নববিধানের নামে জাতীয় মহাসঙ্ঘ স্থাপনের সূত্রপাত করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এই দল-গঠনের ভাব বাল্যকালেই কেশবজীবনে দেখা গিয়াছিল। এই সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন।

দল-গঠন

আমি শ্রীকেশবের বাল্য-সখা মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্য আংশিক ভাবে নিম্নে প্রকাশ করিলাম,—

"He [Keshub Chunder Sen] was a noble pure-minded boy, free from falsehood, free from vice. He scorned to associate with bad boys. They had to simulate some of his purity when they approached him......Truly he was a born king in our boyish world. He was nearly of the same age as his companions, but he was in a higher form of the school ; his talents, every body said, were high, so high that we could never form any definite notion of their altitude ; in short, there was that in him which made us regard him with a sort of fear, and we could not but feel he was our master."

বাস্তবিকই বালক কেশবের ভিতরে এমন অপার্থিব কিছু ছিল যাহার শক্তি অসীম, এবং যাহা চতুর্দ্দিক্ হইতে সমবয়স্ক বালকগণকে কি এক যাদুমন্ত্রবলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাঁহার বশতাপন্ন করিত। পরবর্ত্তী সময়ে এই শক্তি কি অলৌকিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল! আমি পূর্ণপ্রাণে বিশ্বাস করি যে এই অদৃশ্য বস্তুটী পুণ্যদীপ্ত প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কেহ কেহ বলেন যে শ্রীকেশবের চরিত্রে শৈশব হইতেই "আধিপত্যের ভাব" বর্ত্তমান ছিল। এই কথা তাঁহার নিজের সম্পর্কে না খাটিলেও তাঁহার হৃদিস্থিত গুপ্ত ভগবৎপ্রেমের সম্পর্কে খুবই সত্য। আমি পূর্ব্বেই আভাসে বলিয়াছি যে প্রেম অন্যকে অদৃশ্যভাবে শুধু টানে না, কিন্তু টানিয়া আনিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লয়। সংসারে এমন সাধ্য কার যে প্রেমের আধিপত্য অস্বীকার করে? কে না বলিবে যে প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তির নিকটে সকলের মস্তকই অবনত?

এই দলগঠনের দুইটী কারণ শ্রীকেশব নিজেই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।—(১) মানুষ প্রস্তুত করা (২) মনুষ্যজাতির সেবা করা। প্রথম কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—

দলগঠনের কারণ

"I am called to form men. And this has been my earnest endeavour for decades together. Whoever come to me, I take charge of them. The formation

of their spiritual character is the object of my absorbing interest." —The Apostle's Calling.

দ্বিতীয় কারণ তিনি এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—

"I am called to serve men. My object is not merely to look to the spiritual welfare of men, but also to their bodily welfare. I can never rest until I see them provided for. I do not want to show that I take this deep interest in my brothers, but I declare before my conscience and the witness of God that unless I can serve my bretheın I fear I shall have no salvation." —The Apostle's Calling.

যৌবনের আরম্ভে শ্রীকেশবের প্রচ্ছন্ন ভগবৎপ্রেম নব-বিশ্বাস সংস্পর্শে তেজোময় মূর্ত্তি ধরিয়া মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীকে নবজীবন দানে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য ধাবিত হইল। সকলেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরের নামে দলবদ্ধ হইয়া উত্থান করুক এবং মানবজাতির উদ্ধারের জন্য দেহ-মন-প্রাণ প্রেমময়ের চরণে উৎসর্গ করুক, ইহাই হইল তাঁহার প্রাণের কামনা।

যৌবনে প্রেমের বংশীধ্বনি

ব্রহ্ম-সাধনের ভিতর দিয়া নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য যুবক কেশবের হৃদয় সত্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে আপনার নির্জ্জন

প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পরে তাঁহার কয়েকটি অনুগামী বন্ধু তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও তাঁহার দর্শন না পাইয়া অবশেষে দ্বিতল ছাদের উপরে গিয়া দেখিলেন যে তিনি প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আকাশের পানে তাকাইয়া কাতর স্বরে বলিতেছিলেন,—

"হে ঈশ্বর, কেন আমি নিষ্ঠুর হইলাম? কেন আমার জীবন জগতের জন্য উৎসর্গ করিলাম না? তুমি আমাকে প্রেমিক কর, প্রেমিক কর।"

রাত্রি একটু গভীর হইয়া আসিলে যখন সমস্ত পৃথিবী শান্তভাব ধারণ কবিত তখন দেশের পাপতাপ ও অনাচারের কথা স্মরণ করিয়া যুবক কেশবের হৃদয় কি এক অব্যক্ত প্রেমের তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিত। তিনি আর গৃহে থাকিতে না পারিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং সংসারের অসারতা সম্পর্কে চিত্তোন্মাদক কথা লিখিয়া নানা স্থানে দেয়ালের গায় লাগাইয়া রাখিতেন। ঐ সমস্ত লেখা পড়িয়া একটী লোকেরও প্রাণে যে ধর্ম্মের আগুন জ্বলিয়া উঠে নাই তাহা কে বলিবে?

অনেকেই জানেন যে ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে ভোগবিলাসের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের নামে তাহাদের সমস্ত জীবন জগতের হিতসাধনে উৎসর্গ করিতে পারে

তাহারই প্রস্তুতির জন্য শ্রীকেশবচন্দ্র "ব্রহ্মবিদ্যালয়" স্থাপন করেন। এখানে তিনি ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া কি যে প্রমত্ত ভাবে যুবকগণকে সেবকদলভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেন তাহা শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথের নিম্নে উদ্ধৃত সাক্ষ্য হইতে কিছু বুঝা যাইবে,—

"কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়? আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় তাহা আপন বেগে চলিয়া যাইত, কে তাহা নিবারণ করে?......বক্তৃতা কালে কখনও চীৎকার করিতেন আর বলিতেন, তোমরা ধর্ম্মেতে পাগল হইবে না? দুই জনও পাগল হইয়া সংসার ছাড়িবেনা? কখনও ঈশ্বর-প্রেমে নিজে নিমগ্ন হইয়া এমনই অজস্র অমৃত বর্ষণ করিতেন যে শ্রোতা যুবকদের চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা বহিত।......একদিন জনৈক সম্ভ্রান্ত অধিক-বয়স্ক ব্রাহ্ম হঠাৎ ব্রহ্মবিদ্যালয় দর্শন করিয়া আসিয়া বিস্ময়াপন্নভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, একটী গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এমনই নিস্তব্ধতা যে ঘরে যেন কেহই নাই। কেবল মাত্র একটী চীৎকারধ্বনি উঠিতেছে, আর উহাতে এই কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'তোমরা সকলে উন্মত্ত হও। উন্মত্ত না হইলে কিছুই হইবে না।'......তিনি সিংহনাদে যখনই শ্রোতাদিগকে সংসারের ভার ভগবানের হস্তে দিয়া স্ত্রী ও পিতামাতা এবং পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন, তখন তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন পবিত্রাত্মা আবির্ভূত হইয়া

যুবকবৃন্দের মনে আঘাত করিতেন। যে কয়েকটী যুবা অল্প দিন পরেই প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রথমে প্রস্তুত করে।"— স্মৃতি-লিপি।

জগদ্বাসীকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলা যে কেশব-জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল তাহা তিনি নিজেই পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন,—

"I am called to awaken the world, and from my early boyhood before I joined any church or any community, I tried to awaken men.…… I will continue to call and awaken as long as my voice is left to me."—The Apostle's Calling.

ভারতের কৃতী সন্তান স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন,—

"He was the author of a great revival,—he called forth into vigorous life the dormant moral and religious instincts of his country-men. His was the word that broke the spell, that roused the sleeper from his sleep, and communicated the flutter of a new life into an all but dead system." —The Bengalee.

ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইতেই যাঁহার উদার প্রেমোম্মত্ত হৃদয় সমস্ত জগতের জন্য প্রসারিত হইয়াছিল তিনি কেনইবা

না "author of a great revival" হইবেন? বিশ্ব-প্রেমই এই অদ্ভুত যাদুকরের মন্ত্রবল ছিল। আকাশ যেমন বায়ু-মণ্ডলীকে গ্রাস করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহার অসাধারণ প্রেমও তেমনি সমুদয় মানব-মণ্ডলীকে আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"অসাধারণ উদার প্রেম"।

(কথা ও কাহিনী)

শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধানঘোষণার প্রায় পাঁচ মাস পরে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি!"—এই বাণীর ভিতরে বিন্দুমাত্রও ভাবুকতা নাই।

কেশব-চরিত্রের ভিতরে একটু প্রবেশ করিলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁহার প্রেম প্রকৃতই অসাধারণ। ইহা এমনই তমোনাশক ও মৃত-সঞ্জীবন, এমনই সম্প্রসারক ও অভেদাত্মক, এমনই নবভাবোদ্দীপক ও চিত্তোন্মাদক, এমনই মধুর ও শান্তিঘন যে সংসারের শত্রুমিত্রের উপর ইহার প্রভাব ও ক্রিয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এই জন্যই ভারতের লোক তাঁহার একটী নূতন নাম রাখিয়াছিল "যাদুকর"।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীকেশব যখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার হৃদিস্থিত বিশ্বজয়ী প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে বলিয়াছিলেন—

"সময়ে সময়ে ভাবি আর মনকে বলি, মন, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি, তুমি কি ভালবাসিয়া মরিতে পার? ভালবাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। শত্রুগণ আক্রমণ করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রাণের প্রগাঢ় ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভাল-বাসার মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ববিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। পরকে ভালবাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত।"— (২৩শে বৈশাখ, ১৮০০ শক)

শ্রীকেশব তাঁহার প্রাণের অতি প্রিয় মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমিদারী নাই, আমি বিষয় কার্য্য করিতে কার্য্যালয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাইভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি

অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? বল আমি ২৪ ঘণ্টা বসিয়া কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুতুল গুলিকে সাজাই, কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন, আমার মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি দুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব? অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ, এই আমার কার্য্য। এই জন্য এখনও আছি, এই জন্য এখনও থাকিব।"— (২৩শে বৈশাখ, ১৮০০ শক)

প্রেমের এমন প্রাণ-ভুলান সুধামাখা কথা আর কি কেহ কোথাও কোন দিন শুনিয়াছেন? ইহা তাঁহার জীবনের কথা; সত্য ইহার সাক্ষী।

কেশব-চরিত্র বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার আশ্চর্য্য মিলন-ভূমি। এই স্বভাব-গত মিলনেই নববিধানের সঞ্চার। যেখানেই বিশ্বাসের আভাস সেখানেই প্রেম-পুণ্যের প্রকাশ। নিমেষের জন্যও ছাড়াছাড়ি নাই! কেশব-জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ভিতরেই এই মিলনের ভাব অনুভূত হইবে। নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।*—

১। শ্রীকেশবচন্দ্রের মুঙ্গেরে অবস্থানকালীন তথাকার বহু যুবক তাঁহার প্রেম-জালে পড়িয়া, কিছু দিনের জন্য

* দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইলেও, নবধর্ম্মের নবভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য উক্ত যুবকগণের কোন কোন অভিভাবক তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ঘোরতর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন "গোয়ার গোবিন্দের" মত; তাঁহার কোন আত্মীয় শ্রীকেশবকে ধর্ম্ম-নেতারূপে স্বীকার করাতে তিনি একদিন ক্রোধে বুদ্ধি-হারা হইয়া পাগলের মত লগুড়-হস্তে ভক্তপ্রবরকে বধ করিবার জন্য ছুটিয়া আইসেন; তখন সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। একটা মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই ঐ লোকটীকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ধন্য শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রেম! তিনি অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে, "উহাকে তোমরা ধরিওনা ধরিওনা, আমার কাছে আসিতে দাও", এই কথা বলিতে বলিতে এমনই প্রেম-স্নিগ্ধ-নয়নে তাকাইতে লাগিলেন যে উক্ত বিপথগামী "ভাই" স্তম্ভিত ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলেন, এবং কয়েক মিনিট কাল নীরব নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা কেশব-চন্দ্রের চরণতলে পড়িয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন; পরিশেষে অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া বিভ্রান্ত চিত্তে একেবারে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। সমন্বয়াচার্য্যদেব এই বিপন্ন "ভাইটীর" জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট একান্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি করুণা-সিক্ত স্বরে

লগুড় হস্তে শ্রীকেশবকে আক্রমণ

তাঁহার অনুগামী বন্ধুগণকে বলিতেন "আমার ঐ ভাইটী কোথায় গেল?" ধন্য প্রেমের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া! উক্ত অনুতপ্ত "ভাইটী" বহুদূরে থাকিয়াও একদিন উপাসনা কালে * শ্রীকেশবের হৃদিস্থিত প্রেমের প্রবল তরঙ্গাঘাত নিজের হৃদয়ে পরিস্কার অনুভব করিলেন, এবং ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া দীনসেবকবেশে তাঁহার নূতন গুরুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকেশবের তখন আনন্দ দেখে কে? প্রেমের জয় হইল। (সাক্ষী—ঋষি গৌরগোবিন্দ ও অপর দুটী প্রচারক)

"নর-খাদক ইণ্ডিয়ান!"

২। শ্রীকেশবচন্দ্র নবধর্ম্মপ্রচারের জন্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে গমন করেন তখন তিনি লণ্ডন সহরে সুপরিচিত সার্প্-পরিবারে কিছুদিন অতিথি রূপে বাস করিয়াছিলেন। এই পরিবারের একটী শ্বেতাঙ্গিনী পরিচারিকা কেশবচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত মলিন রং দেখিয়া এবং লোক-মুখে ইনি একজন "ইণ্ডিয়ান" এই কথা শুনিয়া মনে মনে ঠিক করিল যে এই বিদেশীয় লোকটী নিশ্চয়ই একজন নরখাদক রাক্ষস! তাই সে কেশবচন্দ্রের নিকটেতো যাইতই না, দূর হইতে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত! একদিন রবিবার সেই ইংরাজরমণী একটী গির্জ্জাতে গিয়া দেখে যে সমস্ত ভজনালয় উপাসকে পূর্ণ, এবং বেদীর উপর আসীন আছেন সেই "নরখাদক ইণ্ডিয়ান!" যাহা দেখিল তাহা সে প্রথমতঃ বিশ্বাসই

* এলাহাবাদে একজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে

করিতে পারিলনা। কিন্তু শেষে যখন একটু স্থিরভাবে তাঁহার পানে তাকাইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল তখন ভিতরের সমস্ত ভয় চলিয়া গেল; মহাবিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক অজ্ঞাত অব্যক্ত ভক্তিভাবে তাহার সমস্ত প্রাণমন পূর্ণ হইল। শ্রীকেশবচন্দ্র কি এক অপার্থিব জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া মধুর স্বরে বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব কথা কহিতেছেন, এবং সমস্ত জনতা নীরব নিশ্চল হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতেছে! ভগবৎপ্রেমের নবজীবনপ্রদ স্পর্শে ইংরাজপরিচারিকার প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে প্রকৃতই এক মহাধনে ধনী হইয়া গৃহে ফিরিল। সেইদিন হইতেই এই নারী সমস্ত হৃদয়ের সহিত কেশবচন্দ্রের সেবা করিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

(সাক্ষী—ভাই প্রসন্নকুমার ও ঋষি গৌরগোবিন্দ)

৩। শ্রীকেশবচন্দ্রের কয়েকটী শিষ্য বিদ্রোহী হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যে তিন চারিজন পদস্থ লোক একদিন স্থির করিলেন যে তাঁহারা এক সঙ্গে হঠাৎ নববিধানাচার্য্যদেবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এইরূপ কঠোর ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া আসিবেন যে তাহাতে তাঁহার ভালমতই শিক্ষা হয়। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। শ্রীকেশব অপরাহ্ণে নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া একমনে লেখাপড়ার কাজ করিতেছিলেন, এমন সময়ে উপরোক্ত বিরোধিগণ দল

প্রেমের কুহক

বাঁধিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত! তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবা-মাত্রই হাস্যমুখে আদর ও যত্ন করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং এমন মিষ্ট ভালবাসার সহিত তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা নিমেষ যাইতে না যাইতেই কি এক কুহকের ভিতরে পড়িয়া তাঁহাদের আসল Mission ভুলিয়া গেলেন, এবং মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রদ্ধার সহিত ভক্তপ্রবরের কথাই শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া একটী কথাও না বলিয়া লজ্জিত মনে ক্ষুব্ধ চিত্তে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই ভদ্রমহোদয়গণ আর কোনও দিনই শ্রীকেশবকে অপদস্থ করার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই।—

(একাধিক প্রচারকের সাক্ষ্য)

প্রেমাহত চোর

৪। একবার শ্রীকেশবচন্দ্রের জনৈক ভৃত্য কোন জিনিষ চুরি করিয়া ধৃত হয়। অনেকেই অপরাধীকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে বলিয়া খুব ভয় দেখাইতে লাগিল; কেহ কেহ প্রহার পর্য্যন্তও করিতে প্রস্তুত। এমন সময় শ্রীকেশব তথায় উপস্থিত হইলেন। লোকটার অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি শান্ত ভাবে তাহার হাত ধরিয়া দেবালয়ে চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে এমনই ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে পাপীর হৃদয় তাহাতে গলিয়া গেল; সে অনুতপ্তমনে

আপন দোষ স্বীকার করিয়া উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু প্রেমের অবতার কেশবচন্দ্র তাহাকে কোন দণ্ডই প্রদান করিলেন না। অর্থের অভাবে চুরি করিয়াছে মনে ভাবিয়া তিনি তাহার বেতন বাড়াইয়া দিলেন এবং গৃহকার্য্যের বিশেষ ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন! এই সময় হইতে উক্ত চাকর আর কখনও কোন দুষ্কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। (সাক্ষী—ভাই উমানাথ)

৫। প্রেমের গতি বিধি বড়ই রহস্যময়! ইহা অনেক সময় লোক-চক্ষুর অগোচরে দূরদূরান্তরে গিয়াও এমনই আশ্চর্য্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে বিজ্ঞান তাহার কারণ নিরুপণ করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেশবজীবনে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে।

প্রেমের আশ্চর্য্য ক্রিয়া—অদ্ভুত ঘটনা

শ্রীকেশবচন্দ্রের হৃদয়-নিস্থত ভক্তিসুধাস্রোতে যখন মুঙ্গের ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন এক নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি এই নবীন ভক্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি প্রত্যহই বহু দূর হইতে আসিয়া ভক্তদলের সঙ্গে উপাসনা ও নাম-কীর্ত্তনে আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন। শ্রীকেশবের কাছে যাওয়া তাঁহার একটী নেশা হইয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি হরিকথা শুনিতে শুনিতে মহাভাবে এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে অধিক বেলাতে যখন উপাসনা শেষ হইল তখন তাঁহার আর নিজ গৃহে

ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি রহিল না। তিনি চুপটী করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে যদি ওখানেই তাঁহার আহারের একটু সুবিধা হয় তবে তিনি সমস্ত দিনটীই কেশব-সহবাসে পরম সুখে কাটাইতে পারিবেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহার ভাব স্বভাব লক্ষ্য করিয়া উহার আহারের বন্দোবস্ত ওখানেই করা হয় এইরূপ ইচ্ছা মনে মনে করিতেছিলেন, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। এই লোকটী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে কেহই তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিতেছেন না, তখন দুঃখিত মনে সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকেশব বড়ই ব্যথিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি গম্ভীরভাবে তাঁহার অনুগামী বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এই যে একটী ভাই চলিয়া গেলেন তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত এখানে করিতে কি কাহারও আপত্তি ছিল ?"

উত্তর হইল,—

"না, আমাদের কাহারও কোন আপত্তি ছিল না।"

শ্রীকেশব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হইবে কি ?"

আবার উত্তর হইল,—

"তাহা কি সম্ভব ? তিনিতো এতক্ষণে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন !"

শ্রীকেশবচন্দ্র প্রফুল্ল মনে "আচ্ছা দেখা যাবে", এই কথা বলিয়া একটী মৃদঙ্গে কয়েকবার আঘাত করিলেন। কি আশ্চর্য্য যে ভক্তপ্রবর এইরূপ করাঘাত্রই সেই লোকটী সেই সময়ে এক মাইলেরও অধিক দূরে হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা এক বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া অন্তরের অন্তরতম দেশে এই অনুভব করিলেন যে শ্রীকেশব যেন তাঁহাকে অধীর প্রাণে আহ্বান করিতেছেন! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি দ্রুতবেগে ফিরিয়া গিয়া সমন্বয়াচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক্! বলা বাহুল্য যে সেইদিন উৎসবানন্দ শতগুণ বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।— (সাক্ষী—ঋষি গৌরগোবিন্দ ও মহারাণী সুনীতি দেবী)

৬। মুঙ্গেরের আর একজন অধিবাসী নবভক্তির স্রোতে পড়িয়া সর্ব্বপ্রকারে "কেশব-পন্থী" হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকেশব ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না, এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে প্রস্তুত হইতেন না। ব্রহ্মানন্দদেবও তাঁহার এই ভক্তটীকে খুব স্নেহ করিতেন।

প্রেম-রাজ্যে "ছায়াবাজি"

একদিন ভক্তি-তীর্থের এই যাত্রী শ্রীকেশবের উপাসনায় যোগদান করার অভিপ্রায়ে বহুদূর হইতে আসিতে আসিতে পথে অসুস্থ হইয়া পড়ায় নিজগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাহার মনে হইল যেন কেশবচন্দ্র বহু

দূর হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন! তিনি আর পশ্চাৎপদ না হইয়া সম্মুখের দিকেই ছুটিলেন, এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্রীকেশবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ এইভাবে আগমন কেন?" ভক্তের ভক্ত উত্তর করিলেন,—

"আপনি যেন কিছুই জানেন না! এইতো আমি গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলাম অমনি নিষেধ করা হইল; এখন আবার জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় আসা হইল কেন!"

শ্রীকেশব একটু হাসিলেন, হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই ভক্তিমান্ লোকটী ১৮১৪ শকেও ঋষি গৌরগোবিন্দের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগ রাখিয়া চলিতেছিলেন।— (সাক্ষী—ঋষি গৌরগোবিন্দ)

৭। একদা শ্রীকেশবচন্দ্র কলুটোলাস্থ ভূতল গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নিম্নতলের সোপান হইতে কাহার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। যিনি আসিতেছিলেন তাঁহাকে দেখিবামাত্রই উৎফুল্ল প্রাণে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমিই আসিতেছ।" আগত ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিই যে আসিতেছিলাম তাহা আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন?" শ্রীকেশব স্নেহের সহিত উত্তর করিলেন,—

"আমার কি তোমাদের ভিন্ন ভাবিবার বিষয় আর কিছু

আছে? আমি দিবানিশি কেবল তোমাদের কথাই ভাবি। আমি তোমাদের শরীর দেখিনা, আত্মা দেখি। পাখীর পায় রজ্জু বাঁধিয়া শিকারী যেমন উহাকে ধরিয়া রাখে, তেমনি আমি তোমাদের আত্মাকে বাঁধিয়া আমার কাছে রাখিয়াছি।"

আত্মিক রাজ্যের "শিকারী"

(সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

৮। নববিধান ঘোষণার পরে একদিন কয়েকজন প্রেরিত-প্রচারক কমল-কুটীরে বসিয়া কে কি ভাবে কার্য্য করেন তাহারই প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকেশবচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া প্রেম-বিগলিত-কণ্ঠে বলিলেন,—

"তোমরা সকলে অনেক মহৎকার্য্য করিয়াছ, একটা বিষয়ে তোমাদের ভিতরের দৃষ্টি এখন পর্য্যন্তও খুলিয়া যায় নাই; তোমরা দেখিতেছনা যে একটা লোক কিরূপে তোমাদের সকলকে বুকে করিয়া ওপারে যাবার জন্য দিবানিশি ভবসাগরে সাঁতার দিতেছে।" (সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

পরিত্রাণের পরম সহায়

৯। শ্রীকেশবচন্দ্র তাহার অনুগামিগণকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। মাতা যেমন তাহার প্রিয়তম শিশুকে ক্ষণকাল দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না তিনিও তেমনি তাঁহার হৃদয়-বন্ধুগণের বিরহ মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারিতেন না। দূরদেশ হইতে আগত এক একটী শিষ্যকে তিনি বহুকাল পরে লাভ করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সন্ধ্যার

অদ্ভুত প্রেমের মানুষ

পরে যখন নববিধানের প্রেরিত ও সাধকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন, তখন তিনি নীরবে স্থির নেত্রে এমনি স্নেহের সহিত প্রত্যেকের মুখপানে তাকাইতেন যে তাহাতে সকলের প্রাণ একেবারে উদাস হইয়া উঠিত। তাঁহার দৃষ্টি-স্পর্শে প্রকৃতই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইত, এবং হৃদয় অমৃতসলিলে অভিষিক্ত হইত। তিনি সকলকে বলিতেন, "আর কি করিবে? কেবল নিঃশব্দে সকলের মুখপানে তাকাও।" শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন শ্রীকেশব সম্পর্কে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন,—

"নানাদেশে বেড়াইয়া অনেক লোকই দেখিয়াছি, কিন্তু এমন একটী লোক আর কোথাও দেখিলাম না। এই সংসারে অনেকের নিকটেই ভালবাসা পাইয়াছি, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের এমন মধুর আস্বাদ কোথাও আর পাইলাম না।"

নববিধান ঘোষণার পরে একদিন শ্রীকেশব নিরালায় বসিয়া আপনার বুকের উপর ভূমণ্ডলের মানচিত্র আঁকিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কয়েকটী প্রিয় অনুগামী তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কি অদ্ভুত কাজ করিতেছেন?" শ্রীকেশবচন্দ্র মধুর স্বরে উত্তর করিলেন,—

সমস্ত পৃথিবীকে বুকের ভিতর নিয়া আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তাই এত আনন্দ হইল যে তাহার বাহ্যিক প্রকাশ এইভাবে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না!"

(সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

১০। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পরে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্রীকেশবকে দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশ্ন, ব্রহ্মানন্দের উত্তর

"আমার বড়ই আশা ছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তালতরুর ন্যায় সরল ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশকে স্পর্শ করিবে; তুমি তাহাকে ডালপালা দিয়া অবনত করিলে কেন ?"।

ব্রহ্মানন্দদেব বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন,—

"সহস্র সহস্র নরনারীব পাপতাপদগ্ধ প্রাণ ছায়াদানে জুড়াইবার জন্য !" (সাক্ষী—ঋষি গৌরগোবিন্দ)

১১। কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের কোন একটী শিক্ষিত যুবক সঙ্গদোষে অত্যন্ত পাপাসক্ত হইয়া পড়েন। দুর্নীতির পথে চলিতে চলিতে যখন তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি নিজেই নিজের মহাসর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কোনপ্রকারে স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া কাতরপ্রাণে বলিলেন,—

"আমি একজন মহাপাপী, ভিতরের আগুনে দিনরাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিনা। আপনি আমাকে ছায়াদানে রক্ষা করুন।"

পরমহংসদেব যুবকের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণাসিক্ত স্বরে উত্তর করিলেন,—

"আমার কাছে কেন আসিয়াছ? আমি তো একটী রাড়া তালগাছ; নিজেই সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইতেছি, তোমাকে আর আশ্রয় দিব কি? যদি বাস্তবিকই আশ্রয় চাও তবে ঐ যে কলিকাতায় একটী প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতেছ তাহারই শীতল ছায়ায় গিয়া বস; তোমার মত অনেক লোকই ঐ গাছটীর তলে আশ্রয় নিয়াছে।"

বটগাছ ও তালগাছ

উল্লিখিত "প্রকাণ্ড বটগাছটী" শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র!

(সাক্ষী—ভাই ত্রৈলোক্যনাথ)

হা ব্রহ্মানন্দদেব! তোমার প্রেম কি বস্তু তাহা বুঝিলাম না। পৃথিবীর নরনারী তোমার ভগবৎপ্রেমের সামান্য একটু আস্বাদ পাইয়াই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যদি তাহারা তোমার হৃদয়-সাগরে একটীবার ডুব দিতে পারিত, তবে সেই অতল-তলে যে মাণিকের দেশ দেখিতে পাইত তাহা ছাড়িয়া কি তাহাদের মন সংসারে আর ফিরিয়া যাইতে চাহিত? সমস্ত জগৎ তোমারি, কেননা তুমি জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছ। অনন্ত প্রেম-রাজ্যের তুমিই অধিকারী; কারণ. তুমি সেই রাজ্যের জন্য আপনাকে বিনষ্ট করিয়াছ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

"টানা জাল।"

শ্রীকেশবচন্দ্রের বয়স যখন ২২ বৎসর তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার প্রথম ধর্ম্মপ্রচার যাত্রা। তিনি এই তরুণ বয়সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেশে ধর্ম্মের কি যে মহা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং রেভারেণ্ড ডাইসনের ন্যায় শক্তিশালী খৃষ্টীয় প্রচারক তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতে আসিয়া কি ভাবে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সুবিখ্যাত কর্ম্মবীর ডাক্তার ডফ্ যুবক কেশবের বিস্ময়োদ্দীপক ক্ষমতা এবং তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের একান্ত অনুরাগ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"The Brahmo Somaj is a power—a power of no mean order—in the midst of us."

এই প্রচারের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রীকেশব স্বয়ং লিখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি ইহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার

প্রথম ধর্ম্মপ্রচার যাত্রা

প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে আমার ক্ষুদ্র বলে এ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অত্যন্ত সুকঠিন।......যাহা হউক, কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও ঈশ্বর-প্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই "টানাজাল" ফেলিয়াছি।......অনেক লোক আসিয়াছে, ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে।......গূঢ়রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে কেবল বাহ্য আড়ম্বরে ধর্ম্মপ্রচার হয় না।......প্রীতি যে ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটী মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।"

সত্যশিবসুন্দর পরমেশ্বর যাঁহাকে বিশ্ব-প্রেমিক রূপে সংসারে পাঠাইয়াছেন তিনি যে ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতেই "প্রীতির টানা জাল" ফেলিয়া দলে দলে মানুষ ধরিবেন এবং তাহাদিগকে নববিধানের রাজ্যে নিয়া ছাড়িয়া দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীকেশব প্রীতিকে "ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান উপায়" বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবন ও চরিত্র দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবে জগৎকে দেখাইয়াছেন যে—

"প্রীতিঃ পরম সাধনম্!"

পৃথিবীতে শ্রীকেশবচন্দ্রের অনেক নূতন নাম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "Fisher of Men" একটী। তিনি সত্যই

"Fisher of Men"

"Fisher of Men" ছিলেন। ধীবর যেমন টানাজাল ফেলিয়া মাছ ধরে, তিনিও তেমনি "প্রেমের টানাজাল" ফেলিয়া নানাজাতীয় মানুষ ধরিতেন। এই অভ্যাসটী তাঁহার ভিতরে বাল্যকালেও দেখা গিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই মানুষধরার যাদুশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অপরিসীম হইয়া উঠে। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতের নানাস্থানে, যেখানেই তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গিয়াছেন সেখানেই হাজার হাজার লোক এই প্রেমের জালে পড়িয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার সাক্ষ্য দান করিয়াছে। ইহা যে সত্য তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ ক্রমে অনেক পাওয়া যাইবে।

শ্রীকেশবের অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি-লিপিতে লিখিয়াছেন—

"১৭৮০ শকে কোন বিশেষ ঘটনার জন্য হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন ধারণ করিল। এই সময়ে আমাদিগের প্রিয়তম আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মুখশ্রী, প্রশান্ত ও অমৃতবর্ষী দৃষ্টি, অন্তরের সংক্রামক ব্রহ্মানুরাগ, অদ্ভুত চরিত্র এবং সুমিষ্ট বাক্য যেন চারিদিকে মোহিনীশক্তি বিস্তার করিয়া দলে দলে যুবকদলকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল।"

শ্রীকেশব যুবকদলকে শুধু "ধরিয়াই" সন্তুষ্ট থাকিতেন না; তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মসন্তান যাহাতে ফুটিয়া দিব্য আকারে বাহির হইতে পারে তাহারও উপায় অবলম্বন করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গত সভা" আসল মানুষ বাহির করিবার একটী আশ্চর্য্য কল। কলুটোলার ভবনে নিম্নতলগৃহে এই সভা হইত। যুবকবৃন্দ শ্রীকেশবের কি এক মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার কাছে চলিয়া আসিতেন। তিনিই ছিলেন এই মিলনের মধ্য-বিন্দু। তাঁহারই হৃদিস্থিত গুপ্তপ্রেম অলক্ষিত ভাবে সকলের হৃদয়কে একত্র বাঁধিয়া জমাট করিয়া দিত। দিনের পর দিন এই সভায় ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব এবং অপরিহার্য্য অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হইত। রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাঁহাদের প্রসঙ্গ ফুরাইত না। কোন কোন দিন রাত্রি ভোর হইয়া ৬টার তোপ পড়িয়া যাইত তথাচ সকলে একত্র। গৃহের লোকজন গভীর নিদ্রায় মগ্ন; চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ ও আঁধারে ঢাকা। কেবল সেই প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র একটী দীপ জ্বলিতেছে. এবং কয়েকটী উন্মত্ত যুবক কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছেন, কখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভগবানের জয়গান করিতেছেন, আবার কোন কোন সময় মহাভাবে বিহ্বল হইয়া অনুরাগসূচক কথা সকল বলিতেছেন। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন সেই ঘরটীর নাম রাখিয়াছিলেন "পাগলা গারোদ"।

সঙ্গত-সভা—
"পাগলা গারোদ"

ক। "প্রেরিত দল।"

শ্রীকেশবচন্দ্রের "প্রেরিত দল" পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ভাবে একটার পর একটী অজানা অনামা লোক তাঁহার প্রেম-জালে পড়িয়া চিরকালের জন্য তাঁহার হইয়া গেলেন, এবং এইরূপে ক্রমে একটা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নূতন সেবকদল দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, তাহা যখন পৃথিবী জানিতে পারিবে তখন সকলের নিকট ইহা ভোজবাজার মত মনে হইবে। প্রেরিতপ্রবর ঋষি গৌরগোবিন্দ "এই মন-চোরের জালে পড়া" সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"গৃহস্থেরা সাবধান! এবার আর একজন বিষম চোর [শ্রীকেশব] আসিয়াছেন। আজ ইঁহার জন্মদিন। ইনি তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। ইঁহার জালে পড়িলে আর সে জাল কাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ের সাক্ষী আমরা নিজে। আমরা কে কোথায় ছিলাম, কোনও দিন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পরিচয় ছিলনা। অতি সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণে তিনি প্রবেশ করিলেন, আর সেই যে মন চুরী করিলেন, আজ পর্য্যন্ত এত গণ্ডগোল হইল, অথচ সে মন ফিরিয়া পাওয়া গেলনা। এই চোরের জালে পড়িয়া ঘর গেল, কুটুম্ব গেল, স্বজন গেল, এখন পরকে লইয়া পরের গৃহে নিয়ত একত্র বাস।" —কেশবচন্দ্র অপহারক।

এই অদ্ভুত দলের বিস্তারিত বিবরণ পরে যথাস্থানে দেওয়ার

চেষ্টা করিব। এখানে দুইটীমাত্র উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

১। "জাগ! উঠ! চল!"

অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত-কর্ম্মী শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু নববিধানের এক জন "প্রেরিত।" তিনি কিভাবে শ্রীকেশবের সংস্পর্শে আসিয়া প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজ মুখেই আমি শুনিয়াছি। তিনি এই সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল,—

"কি শুভক্ষণেই আমি কেশবচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই আমার প্রাণ কেমন হইয়া গেল, বিশ্বাস না করিয়া পারিলাম না যে ইনিই আমার জীবন-পথের সহায়। তাঁহার সঙ্গে মিলিতে আরম্ভ করিলাম, এবং নবধর্ম্মের ভাব একটু একটু করিয়া হৃদয় মন অধিকার করিতে লাগিল; কিন্তু তখনও সম্পূর্ণরূপে আমার জীবনের দিক্-পরিবর্ত্তন হয় নাই। একদিন আমার চিত্ত বড়ই অস্থির হইল। দিনান্তে গৃহে ফিরিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যূষে আমি আঁধ-জাগন্ত আঁধঘুমন্ত অবস্থায় নিজের জীবনের কথা ভাবিতে-ছিলাম, তখন হঠাৎ একটী মধুর স্বর বংশীধ্বনির মত আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল,—

'অমৃত! জাগ, উঠ, চল।'

মন বলিয়া উঠিল, "এ যে ব্রহ্মানন্দের আহ্বান!" আমি

অমনি জাগিলাম, অমনি উঠিলাম, অমনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে চলিলাম, আর ছাড়াছাড়ি হইল না, কোন কালে হইবেও না।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই "পুরুষ সিংহ" অক্লান্ত মনে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে ছুটিয়া ছুটিয়া মহাতেজ ও বিক্রমের সহিত নববিধান প্রচার করিয়াছিলেন। যখন ভগবানের ইচ্ছায় মহাপ্রস্থানের সময় আসিল, তখন, "ওগো, তোমরা আমাকে তুলে ধর, আমি ফুক্ ক'রে অনন্তের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি", এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মার কোলে চিরতরে অদৃশ্য হইলেন।

আরম্ভও অদ্ভুত, শেষও অদ্ভুত। "ব্রহ্মানন্দী দলের" প্রত্যেক "প্রেরিতই" এইরূপ অদ্ভুত।

২। "কাকা বাবুর" আত্মপরিচয়।

কেশবচরিত্রের প্রেমাকর্ষণ ও পাবন শক্তি যে বাস্তবিক পক্ষে বড়ই অদ্ভুত তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ নববিধানের চিহ্নিত সেবক শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত জীবন। "কাকাবাবু" নিজে এই সম্পর্কে নববিধানবিশ্বাসীসমিতির অধিবেশনে যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বলা বাহুল্য যে তাহার এই সাক্ষ্য ধর্ম্মজগতের এক অমূল্য বস্তু। —

"যেদিন আমি সংসার হইতে তাড়িত হই, আত্মীয়স্বজন যাহারা সঙ্গে ছিলেন—যাঁহাদের ভাবনা আমাকে ভাবিতে

হইত, তাঁহারা মৃত্যু কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, তখন আর কার জন্য পরাধীন ভাবে চাকরী করিব এই চিন্তা আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের দিকে টানিয়া আনিল। ঘর নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, 'আহা' করিবার, চক্ষের জলের সঙ্গে জল মিশাইবার লোক যখন আর কাহাকেও পাইলাম না, তখন ঘুরিতে ঘুরিতে কলুটোলার সেন মহাশয়দের প্রকাণ্ড বাড়ীর তৃতীয়-তল গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আপনারা সকলেই জানেন, এখানে বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট লোক মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাস করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই দয়াপরবশ হইলেন, আমার দুঃখের কথা শুনিয়াই বলিলেন, ভাবনা কি, একটী আফিস আছে, সেখানে কয়েকটী যুবক বাস করেন, তুমি যাইয়া সেখানে কাজ কর। আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহার পানে খানিকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহার দয়াতে মোহিত হইয়া গেলাম।......তাঁহার ভাবে কথায় তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইল। তাঁহার আজ্ঞা মতে আমি আফিসে যাইয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, মহেন্দ্রনাথ, গৌরগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্য-নাথ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।"—

—ভৃত্যের আত্মপরিচয় (১৩২২ সন)

"আমার নিজের সম্বন্ধে এখন এত কথা বলিবার কারণ কি? আমার ন্যায় সামান্য লোকের জীবন পাঠ করিয়া অন্যের কি হইবে একথা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য, আমিও অনেক সময়

একথা চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিশেষ মাহাত্ম্য আমার জীবনে যে ঘটে নাই তাহা আমি কখনই বলিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমার এই অধম নিকৃষ্ট জীবনের সঙ্গে ভগবানের বিশেষ লীলা অনেক প্রকাশিত হইয়াছে।

"বাস্তবিকই এখন আমি সে আমি নই, এখন পাপস্মরণে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পাছে বা পতিত হই, পাছে বা সেই ধনে বঞ্চিত হই, সেই ভয়ে আকুল হইয়া পড়ি! বন্ধুগণ, মাতৃগণ, আমার এই পরিবর্ত্তনের মূল কোথায় এবং কে? আগেই বলেছি আমার যখন সব গেল, আমি যখন পথের ভিখারী হইয়া চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছিলাম, তখন এমন একজনের আশ্রয় পাইলাম যেখানে আসিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল, সকল অভাব পূর্ণ হইল, যাঁহার পবিত্র স্পর্শে আমি নব জীবন, নব আলোক প্রাপ্ত হইলাম। স্ত্রীপুত্রহীন, দুঃখী কাঙ্গাল যে, সে একটী উচ্চপরিবারের একজন হইয়া গেল। সেই প্রেরিত মহাপুরুষ আমার প্রতি কেন কৃপাদৃষ্টি করিলেন, এ প্রশ্ন আমি কাহাকে করিব? কেইবা ইহার প্রকৃত উত্তর দিবেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর সেই পরম দয়ালু পরমপিতার বিশেষ করুণা লুক্কায়িত ছিল। আমি একজনকে পেয়ে, পিতামাতা ভাইবন্ধুর অভাব ভুলিয়া গেলাম। কি সুমিষ্ট ব্যবহার, কি মধুর কথা, কি প্রেমের দৃষ্টি, কি পুণ্যময় সহবাস! সত্যই আমার জীবনে ইহার

পূর্ব্বে এরূপ আনন্দ সুখ আমি আর কখনও পাই নাই। আমার প্রাণ গলে গেল, মন ভুলে গেল, ইচ্ছা হইল এ সহবাস হইতে আমি আর কোথাও যাইব না। সত্যই বিধাতা আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

—ভূদেবের আত্মপরিচয় (১৩২৩ সন)

খ। প্রেমের অভিযান।

শ্রীকেশবের প্রেম শুধু কলিকাতার যুবকদলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই নবীন প্রেমিক নবধর্ম্ম প্রচারের জন্য যেখানে গিয়াছেন সেখানেই দলে দলে লোক তাঁহার "টানাজালে" পড়িয়া তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা যে কি স্বর্গীয় মহাব্যাপার তাহা দেশীয় বিদেশীয় অনেক প্রত্যক্ষদর্শী খ্যাতনামা ব্যক্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি এখানে দুইটীমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কথা বলা যাক্।

১। পূর্ব্ববঙ্গ আত্মহারা!

শ্রীকেশব সাধু অঘোরনাথ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মনাম-সুধা বিতরণের জন্য ১৭৮৭ শকের ১৯শে

কার্ত্তিক পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরে উপস্থিত হন। নৌকাই ছিল তখন যাতায়াতের একমাত্র উপায়। ক্ষুদ্র একখানা "ডিঙ্গী" নৌকাতে তিন জনের একত্র বাস এবং দুই বেলা রন্ধন ভোজন কি যে কষ্টের ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া "ডালভাত" রাঁধিতেন এবং তৃপ্তির সহিত তাহা আহার করিতেন। সেই বিশ্বাস বৈরাগ্যের যুগে দুঃখই ছিল তাঁহাদের সান্ত্বনা এবং কণ্টকই ছিল কুসুমশয্যা। শ্রীকেশব কলিকাতার একজন ধনী সন্তান, উচ্চ বংশে তাঁহার জন্ম এবং সুখ ও বিলাসের মধ্যে অবস্থিতি; তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের নামে এত দুঃখ কষ্ট আনন্দের সহিত বহন করা সামান্য বৈরাগ্য নহে।

তখন হিন্দুসমাজের শাসন বঙ্গের সর্ব্বত্রই অত্যন্ত কঠোর ছিল। শ্রীকেশব একজন নামকরা "ব্রহ্ম গেয়ানী", কাজেই তাঁহার জন্য বৈষ্ণবপ্রধান ঢাকা সহরে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন চাকর কিম্বা পাচক মিলিল না। এক বৈরাগীর আখড়াতে অতি কদর্য্যভাবে যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত তাহাই একজন কুলি মধ্যাহ্নে মাথায় করিয়া লইয়া আসিত। তিনি বন্ধুদুটী সহ অতিকষ্টে এই কড়কড়ে ভাত ও ঠাণ্ডা ব্যঞ্জনে উদর পূর্ত্তি করিতেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার শরীর এই ভয়ঙ্কর অনিয়ম সহ্য করিতে পারিল না; তিনি জ্বর ও শীরপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইলেন, কিন্তু তবুও

উৎসাহ উদ্যম কিছুমাত্র কমিল না। অসুখ নিয়াই তিনি মহাতেজের সহিত নবধর্ম্মের সুসংবাদ সকলকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকেশব এ যাত্রায় ঢাকাতে প্রায় একমাস কাল স্থিতি করেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে এমনি উন্মত্ত ভাবে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভগবানের কথা বলিতেন যে তাহা শুনিয়া হাজার হাজার লোক চমৎকৃত ও ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইত। বিভাগীয় কমিসনার, ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌ মেজিষ্ট্রেট্‌, ঢাকার নবাব প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আফিসের কেরাণী ও পথের বাউল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার প্রেমের যাদুপ্রভাবে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেবচরিত্রের পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া "অনেকের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, অনেক মদ্যপায়ী দুরাচার লোকের নয়ন হইতে অনুতাপাশ্রু বর্ষিত হয়, তাহারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পাপাচারে নিবৃত্ত থাকে।" একটী ভক্ত বৈষ্ণব একদিন তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। "তুই ব্রহ্মজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলি ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলি" বলিয়া পরে মোহন্ত তাহাকে শাসন করেন।

গিরিধি-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন ১৩৩৪ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখের "ধর্ম্মতত্ত্বে" শ্রীকেশবের এই প্রচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"মহাত্মা কেশবচন্দ্র একবার ঢাকাতে উপস্থিত হইলেন, তখন আমরা কলেজের ছাত্র, এবং সেই তাঁহার সহিত প্রথম চাক্ষুস্ পরিচয়। সহরে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল; যে কয়দিন তিনি তথায় ছিলেন ঢাকা নগরী যেন একটা মহা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যেখানে যাও সেখানে কেশবের কথা।......যদি বক্তৃতাব সময় ৪টা তবে দুইটার মধ্যেই বক্তৃতার প্রকোষ্ঠ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান কেহত আর বাকী রহে নাই। ইংরেজ আরমানী ইহুদিতে প্রকোষ্ঠ ভরা। এত বড় সভাতে কেশব যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন তখন শ্রোতাগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। কিন্তু এই হুলুস্থূলের মধ্যে আমাদের কলেজের Principal Mr. W. Brennett একদিনও সেখানে যান নাই।......তাঁহার ধারণা ছিল যে গণিতজ্ঞ না হইলে মানুষ মানুষ হয় না, সুতরাং এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া তাহার সুখ নাই। যাহা হউক, আমাদের অনুরোধে সেই দিবস অপরাহ্ণে তিনি Prof. Lobb প্রভৃতি সহ বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। পর দিবস কলেজের সময় আমরা জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'Sir, কাল কেশববাবুর বক্তৃতা কেমন শুনিলেন?' তিনি বলিলেন, Wonderful! He must be a great Mathematician!" কারণ তাহার ধারণা গণিতজ্ঞ না হইলে এমন পরিষ্কার মাথা হয় না, এবং এইরূপ যুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করিতে পারে না।"

ঢাকা বিশাল ভারতের উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত; শ্রীকেশবের আগমনে এখানে কিরূপ মহাসাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহার একটু আভাস পাইলাম। এখন উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত সুদূর পঞ্জাবও তাঁহার পবিত্র স্পর্শ লাভ করিয়া নবীন ধর্ম্মভাবে কেমন মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

২। পঞ্জাব মন্ত্রমুগ্ধ!

শ্রীকেশব ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পঞ্জাবে গমন করেন। এ যে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার তাহা ভাই মহেন্দ্রনাথের "স্মৃতি-লিপি" পাঠ করিলে অনেকটা বুঝা যায়। আমি সেই "স্মৃতি-লিপি" হইতেই কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"পঞ্জাব প্রদেশে কেশবচন্দ্র নূতনতর প্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিলেন। সেণ্ট্‌পল্‌ যেমন যখন যে দেশে যাইতেন, তখন সেই দেশীয়দিগের সহিত এক হইয়া তাহাদের ভাব ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, কেশবচন্দ্রও সেইরূপ করিলেন। তিনি পঞ্জাবে পঞ্জাবীদিগের সহিত ভাবে এক হইয়া গেলেন। গুরু নানকের ও শিখগুরুদের ভাব যেন তাহার অন্তরে জাগ্রদ্রূপে আর্বিভূর্ত হইল। তাঁহার মুখ দিয়া নানকের কথা ও গভীর ভাব বাহির হইতে লাগিল। পঞ্জাবিগণ

সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান বা মুসলমান প্রচারকদিগের ন্যায় বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, তিনি তাঁহাদেরই পৈত্রিক ধর্ম্ম ও পৈত্রিক হরিধন প্রদান করিতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত। কেশবচন্দ্রকে আপনা-দিগেরই সাধু বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতি করিতে লাগিলেন, এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন।...... চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। যে দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্র চলিয়া যাইতেন, দলে দলে লোকসকল তাঁহাকে প্রণাম এবং তাঁহার সুন্দর মুর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধন্য ধন্য করিত। এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সহজে তিনি রাস্তায় বহির্গত হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে দেখিলেই লোক দলে দলে তাঁহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিত, এবং তাঁহার গতি রোধ হইয়া যাইত। রুগ্ন এবং আবালবৃদ্ধবণিতা কত যে পঞ্জাবী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত তাহার আর সংখ্যা ছিল না।"

শ্রীকেশব লাহোরে "প্রকৃত বিশ্বাস", "প্রার্থনা", "দ্বিজত্ব লাভ" প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বহুজনাকীর্ণ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। লরেন্স হলে" তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য পঞ্জাবের লেপ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড হইতে আরম্ভ করিয়া নগরের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এদেশীয় লোক উপস্থিত থাকেন। সকলেই ধর্ম্মের নূতন কথা শুনিতে শুনিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ

হইয়া গেলেন। সভাক্ষেত্রে ধর্ম্মোচ্ছ্বাসের কি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা আর বলিবার নয়। বক্তৃতান্তে ছোটলাট বাহাদুর গভীর শ্রদ্ধার সহিত বক্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই ব্যাপারের পর কেশবচন্দ্র ছোটলাটের গৃহে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন।

ছোটলাট শ্রীকেশবচন্দ্রকে শুধু আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি লাহোরের উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও পঞ্জাবিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট-গৃহে অতি যত্ন-সহকারে "সামাজিক অভ্যর্থনা" অর্পণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান লাভের জন্য লেপ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের ইচ্ছানুসারে একটা "সংলাপ সমিতি"ও ডাকা হয়; এই সমিতিতে জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রাণ-খোলাখুলি ভাবে ধর্ম্মপ্রসঙ্গও চলিতে পারে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই কেশব-প্রচারিত নবধর্ম্মের প্রতি প্রাণের নিষ্ঠা ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ("ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন এণ্ড পঞ্জাব টাইমস্" এবং "মিরার" পত্রিকা দ্রষ্টব্য।)

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বোখারাস্থ রাজদূত পণ্ডিত মনফুল শ্রীকেশবের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে তিনি সর্ব্বদাই এই "অদ্ভুত মানুষটার" কাছে আসিয়া আপনাকে ধর্ম্মালাপে ডুবাইয়া দিতেন। কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী জানিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রায় চল্লিশ প্রকারের আচার ও মোরব্বা এবং

বহুবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জনের আয়োজন করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে আহার করাইয়াছিলেন।

শ্রীকেশবের "টানাজালে" পড়িয়া কি দেশীয় কি বিদেশীয়, কি কাঙ্গাল কি ধনী সকলেরই একই দশা!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রাচ্য ও প্রতীচীর মিলন।

শ্রীকেশব এক বিরাট্ সভায় প্রেমের মাহাত্ম্য এই ভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন,—

"Love is a heavenly passion that rolls ceaselessly onward. To fix a limit beyond which it shall not pass is as absurd and hopeless as an attempt to drive back the dashing surges of the sea by a 'Thus far shalt thou go and no further'. Love's growth is illimitable, it admits of infinite expansion."—Behold The Light...India.

কেশবজীবন এই উক্তির অভ্রান্ত প্রমাণ। কি স্বদেশে কি বিদেশে যেখানেই তিনি নবযুগধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাইতেন সেখানেই তাঁহার হৃদিস্থিত ভগবৎপ্রেমের ক্রিয়া এই ভাবে

প্রকাশ পাইত। সুদূর ইংলণ্ডে তিনি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পথের শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলকেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভোজবাজি দেখাইয়া কিরূপ বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত; অনেক খ্যাতনামা লোকই এই সম্পর্কে জীবন্ত ভাষায় সাক্ষ্যদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী লণ্ডনের পূজনীয় খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মপ্রচারক Dr. Tudor Jones এসেক্স্ হলে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"He [Keshub Chunder Sen] came to England in 1870, at the age of 32. He produced a tremendous effect wherever he appeared; everyone who saw him, loved him. Gladstone, the then Prime Minister, was greatly impressed by him. He was called in audience by Queen Victoria herself. He visited Edinburgh, Manchester, Liverpool, Stratford-on-the-Avon and many other places. Everywhere he was received with honour. A great national soiree was held in London at Hanover Square Rooms to bid him good bye."—

(Published in "Navavidhan"—23. 2. 28)

লণ্ডন জাতীয় উদারনৈতিক সমিতির বিখ্যাত পরিচালক পণ্ডিত ষ্টিফেন্‌স্ ১৯১০ খৃন্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী লণ্ডন মহানগরীতে এক স্মৃতি-সভায় "কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডভ্রমণ এবং তাহার প্রভাব" এই বিষয় অবলম্বনে একটী অতি উচ্চদরের প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করেন। ইতিহাসের দিক্ দিয়া সাক্ষ্যদানের হিসাবে এই প্রবন্ধের মূল্য অত্যন্ত বেশী। তাই আমি এখানে ইহার কোন কোন অংশ প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম।—

পণ্ডিত ষ্টিফেন্‌স্ শ্রীকেশবচন্দ্রের আলৌকিক দেবজীবন সম্পর্কে কেন সাক্ষ্যদান করিতে প্রস্তুত হইলেন তাহা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"England owes him a debt of gratitude not only for his direct, but also for the influence of his indirect teaching. As one of the diminishing number of the survivors of 40 years ago, who came under his influence and the charm of his personality, the writer deems it a privilege to do homage to his name on the day which is consecrated to his memory as the anniversary of his ascension to the Higher Life"

এই উচ্চ-পদস্থ মহাজ্ঞানী ইংরাজ মহোদয় কোন্ মহামন্ত্রে কি ভাবে মুগ্ধ হইয়া কেশবচন্দ্রের প্রেমজালে বন্দী হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন,—

"His was a personality, like his teaching, quite exceptional and unique. To look at him was a revelation, to hear him was a privilege; but to speak with him was to bring yourself into communion with one who seemed to be already living the higher life of the spirit, whilst in the world of men and human affairs.......

"The first time the writer had the advantage of coming into close personal contact with him was on the occasion of his first public address in the north of England at that great commercial centre Liverpool, and the place was the Liverpool Institute.........So great was the impression produced upon the writer—then thirsting for Eastern illumination—that he felt an irresistible impulse compelling him to follow Keshub Chunder Sen in all his subsequent sojourning in England, that such an occasion of hearing at every stage so great a scholar, orator and Teacher, should not be missed, as the opportunity was never likely to come again."

দর্শন ও বিজ্ঞানের লীলানিকেতন ইংলণ্ডে শ্রীকেশবচন্দ্রের

নবধর্ম্মপ্রচার কি যে আলৌকিক ব্যাপার তাহার একটু আভাস দেওয়ার জন্য পণ্ডিত ষ্টিফেন্‌স্‌ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত লিভারপুল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে বিরাট্‌ ধর্ম্মসভার এক জীবন্ত ছবি অঙ্কন করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"The occasion was especially noteworthy for the many learned and honoured names surrounding the distinguished Indian visitor upon the platform, in the front rank of whom was the revered philosopher and saint, james Martineau, fittingly described at his death as 'an intellectual king of men'.........

"The hall of the Institute was packed from floor to ceiling. Though none were out of sympathy, many came merely to satisfy an intelligent curiosity, and others to criticise.

"An Indian teacher in western Europe! What could he teach but the lessons of Hindu mythology, or the moral deductions of the Vedic hymns!

"Had not Europe reached a higher plane than that?.........

"These were some (as the writer remembers them) of the questionings of many in the great audience of that day whilst awaiting the appearance of the distinguished visitor.

"As he entered the Hall with the Chairman on his left and Martineau on his right, you at once felt you were in the presence of a man of wisdom and insight. This impression grew upon you during every moment of that meeting.

"A commanding figure, well-proportioned, in his Eastern garb so becoming to him, with a face beautifully moulded into classic expression, placid and serene with that true humility which bespeaks intellectual greatness ; you felt, as his presence grew upon you, that you might have only 'to touch the hem of his garment' to catch something of the apparently divine sanctity of his life......

"In an address of a little more than an hour—all too short to those who heard it,—the preconceptions and prior criticisms of many of the audience were dispelled and dissolved by the

convincing oratory of this remarkable Prophet and Teacher to whose memory we pay our gratified tribute of love and gratitude to-day.

"Throughout this never-to-be-forgotten oration he held his audience spell-bound and enraptured. His voice so melodious and persuasive, seemed like music to responsive ears; and his words themselves at times were heard as if they were descending from a region of light and glory, which the audience had not before experienced. Here was a man the charm of whose personality and the chaste beauty of whose language was stirring not only the minds, but the souls of his hearers."

উপরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটীমাত্র ধর্ম্মসভার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকেশবচন্দ্র ইংলণ্ডের বহু স্থানেই বিপুল জনতার সমক্ষে এইভাবে নবযুগধর্ম্মের নবতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন: সর্ব্বত্রই এই স্বর্গীয় দৃশ্য!

শ্রীকেশবের ধর্ম্ম-প্রতিভা ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের যে যুগ-পরিবর্ত্তন সাধন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পণ্ডিত ষ্টিফেন্‌স্ বলিতেছেন,—

"The teaching of Keshub Chunder Sen in

England has never been forgotten by his educated survivors.

"But more valuable than his direct teaching was the influence it had in breaking down many mental barriers of racial and national prejudices which had long prevailed in Europe respecting India and the East generally. These prejudices fell wherever he spoke. They have continued to fall ever since.........

"He laid the permanent foundation of a wider love and deeper soul-sympathy between England and India than any one before him.

He—and he alone—inaugurated that wider soul-sympathy which permeated our colleges and universities—our schools of law and medicine and of science and art, wherever professors and students co-mingled in the pursuit of their studies.........

"This influence—capable of universal expansion—is, in the writer's judgment, the transcendent glory of his life and work."

ষোড়শ অধ্যায়।

জীবে দয়া।

(কথা ও কাহিনী)

শ্রীকেশবচন্দ্রের হৃদয়-তলে করুণার স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত থাকিত, সংসারের চক্ষে তাহা সহজে ধরা পড়িত না। কাহারও দুঃখ ক্লেশ দেখিলে তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত, কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিতেন না; যাহা কর্ত্তব্য তাহা গোপনে গোপনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। গুপ্ত দয়ার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে অনেক দেখা যায়। মনুষ্যসমাজের দীনহীন কাঙ্গাল যাঁহারা শুধু তাঁহাদের জন্যই তাঁহার চিত্ত অস্থির হইতনা, পশু পক্ষী প্রভৃতির কষ্ট দূর করিবার জন্যও তিনি অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িতেন; তাই তিনি একবার তাঁহার প্রাণের দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"There is not a sparrow, not an ant, Oh Lord, that is not protected by Thy loving and watchful Providence. Thou art kind not only to saints in heaven and on earth, but also to the meanest reptile and the smallest insect that men tread under their feet. If Thou art so kind

to these dumb creatures, why shall I not be?... Father, humble me to the dust and make me a Jaina that I may love and honour the least of Thy creatures.—Prayers.

১। একদিন শ্রীকেশব কমল-কুটীরের বাগানে ঘুরিতে ছিলেন, এমন সময় একটী গো-বৎস বাহিরের রাস্তা হইতে ছুটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে এই সুন্দর নিরীহ জীবটীর মালিক একজন কসাই। সংবাদটী শ্রীকেশবের প্রাণে বড় লাগিল; তিনি তৎক্ষণাৎ বৎসটীকে ক্রয় করিয়া লালনপালনের ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকেশব ও গো-বৎস

(সাক্ষী—ভাই মহেন্দ্রনাথ)

বনের ক্ষুদ্র পাখী ছিল শ্রীকেশবের সাধন-পথের বিশেষ সহায়, তাই বড়ই ভালবাসার বস্তু। তাহারা দল বাঁধিয়া যখন নীল গগনে মনের আনন্দে উড়িত কিম্বা লতাপাতার আড়ালে বসিয়া নানা সুরে গান করিত তখন তাঁহার ভাবোন্মত্ত প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে চিদাকাশে উড়িত অথবা ভক্তি-কুঞ্জে বসিয়া হরিনামামৃত পান করিত। এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি কোথা হইতে কমল-কুটীরে ফিরিবার সময় কলিকাতার রাস্তায় দেখিতে পাইলেন যে নিম্ন শ্রেণীর একটী গরীব লোক কয়েকটী পাখী খাদ্যসামগ্রীরূপে বিক্রয় করার মানসে বাজারে নিয়া যাইতেছে। দেখিয়াই তাঁহার

প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি উচিত মূল্যে পাখীগুলি ক্রয় করিয়া পরম যত্নে বাড়ীতে নিয়া আসিলেন এবং সমস্তই আকাশে উড়াইয়া দিলেন; তখন তাঁহার আনন্দ দেখে কে! পাখীরাও যে মুক্তিলাভ করিয়া মনের আনন্দে উড়িতে উড়িতে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।—

(সাক্ষী—সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ)

কমল-সরোবর ও মৎস্য

২। "কমল-সরোবরে" নানা জাতীয় মৎস্য বাস করিত। শ্রীকেশবচন্দ্র নিজেই তাহাদিগকে আদর ও যত্নের সহিত প্রত্যহ আহার করাইতেন। কোন দিন কোন অনিবার্য্য কারণে তাহারা ঠিক সময়ে খাবার না পাইলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। "কমল-সরোবরে" মৎসগণকে মুক্তভাবে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিলে তিনি সুখে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।—

(সাক্ষী—ভাই উমানাথ)

"দরিদ্র-নারায়ণের" সেবা

৩। শ্রীকেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই দীন দরিদ্রকে কি যে দয়ার চক্ষে দেখিতেন তাহার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। "দয়া" প্রকৃতই তাঁহার আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। কোন মানুষ সংসারের চক্ষে যতই হেয় ও অধঃপতিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, তিনি তাহাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; কেননা, তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখিতেন যে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই স্বয়ং ঈশ্বর সসন্তান বাস

করিতেছেন। "দরিদ্র-নারায়ণের" প্রকৃত ব্যাখ্যা কেশব-জীবনেই পাওয়া যায়। এই জন্যই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে "দয়া বিচার করে না, বিশ্বাস করে।"

কোন এক সময়ে শ্রীকেশবচন্দ্রের একটী দরিদ্র অনুচর সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। এক দিকে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, অন্যদিকে উত্তমর্ণ যেন তাঁহার শোণিত শোষণ করিতেছিল। যখন এই সংবাদ কেশবচন্দ্রের কাণে গেল তখন তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুঃখী ভাইটী যাহাতে রোগের প্রকোপে ও ঋণের চিন্তায় অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত না হন সেই জন্য তিনি আকুল প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; শুধু প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহাকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং অন্য প্রকারেও তাঁহার প্রাণে যাহাতে সান্ত্বনা ও শান্তি আসে তাহার বিশেষ বিধান করিলেন।— (সাক্ষী—ভাই ত্রৈলোক্যনাথ)

অভাবনীয় প্রায়শ্চিত্ত—দয়ার জয়

৪। একবার শ্রীকেশবচন্দ্রের কোন অনুগত সহচর গুরুতর দোষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হন। বিশ্বাসী দলের যাঁহারা এই বিষয় অবগত হইলেন তাঁহারা সকলেই অপরাধীকে "বয়কট্" করিলেন এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা সম্যকরূপে রক্ষা করার অভিলাষে যাহাতে অন্য প্রকারেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয় সেইজন্য কেশবচন্দ্রকে আসিয়া

ধরিলেন। কিন্তু ধন্য ব্রহ্মানন্দের নব দণ্ড-আইন! তিনি তাঁহার বিপথগামী শিষ্যটিকে পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আরও শতগুণ ভালবাসা ও মমতার সহিত আপনার বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া পাপীর একমাত্র দণ্ডদাতা ও পরিত্রাতা পরমেশ্বরের স্মরণাপন্ন হইলেন। নবভক্তের এই আকুল প্রার্থনার ফল হাতে হাতে দেখা গেল। পাপীর প্রাণে অনুতাপের আগুন ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি দিন রাত্র এই জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; শরীরই ষড়রিপুর বাসগৃহ ইহা মনে করিয়া তিনি নানা প্রণালী অবলম্বনে এমনই কঠোরভাবে ইহাকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পাপের এই অভাবনীয় প্রায়শ্চিত্তই তাঁহার মুক্তি লাভের কারণ হইল। করুণাময় হরি তাহার দীন সন্তানকে পবিত্র শুভ্র বসনে সাজাইয়া স্বর্গের পথে লইয়া চলিলেন।

"দয়া" যে বিচার করে না, বিশ্বাস করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত কেশবজীবনে পাওয়া যায়।

(সাক্ষী - ঋষি গৌরগোবিন্দ ও প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথ)

আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীকেশবচন্দ্রের হৃদয়-তলে করুণার স্রোত অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত থাকিত। মাঝে মাঝে এই অমৃতধারা স্বভাবের নিয়মে নির্ম্মল উৎসের আকারে তৃষিত সংসারের দৃষ্টি পথে আসিয়া দেখা দিত। এই স্বর্গীয় দয়া বস্তুতঃপক্ষে এক অভিনব পদার্থ;

ইহার প্রকৃতি ও গতিবিধি নির্ণয় করা সংসারের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ইহার প্রকাশস্থল ইন্দ্রিয়াতীত; ইহার ক্রিয়া বিদ্যুৎচমকের মত অনেকটা সাঙ্কেতিক। ইহার সঙ্গে যে পৃথিবীর সাধারণ "দানধ্যানের" সম্পর্ক খুবই কম তাহা শ্রীকেশবের নিম্নলিখিত দুইটী উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। প্রথম উক্তি—

"Heavenly Voice—This pice, beloved child, thy gift to me, I kiss every day.

"Worshipper—I never gave Thee aught, my God.

"Heavenly Voice—But thou gavest to that blind child of penury"—Prayers.

দ্বিতীয় উক্তি—

"Heavenly Voice—I am well-pleased with thee, beloved child, for in my books I see entered aginst thy name the sum of ten thousand rupees as thy contribution to the Madras famine fund.

"Worshipper—My God, I feel ashamed, I do not remember having paid a single rupee to the fund.

"Heavenly Voice—I saw thee the other

night shedding tears over the distress of thy Madras brethren with genuine. compassion, and I heard thee express a wish to give Rs. 10000 to the sufferers."—Prayers.

বাস্তবিকই শ্রীকেশবের দয়া ছিল স্বয়ংজাত ও অহেতুক। ইহার ক্রিয়া ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক।

বিশ্ব-ভিখারী

যেখানেই দুঃখকষ্ট রোগশোকের করাল মেঘ সেখানেই ইন্দ্রধনুর ন্যায় ইহার প্রকাশ। কাঙ্গালের অশ্রুজলের সঙ্গে নিজের অশ্রুজল মিশাইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করাই ইহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সাধারণতঃ ইহা লোক-চক্ষুর অন্তরালে অতি গোপনে কেশব-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিত, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইলে ইহা বিশ্ব-ভিখারীর বেশে মুক্ত আকাশ-তলে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইত। ইহা যে সত্য ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ঋষি গৌরগোবিন্দ তাঁহার "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"ত্রিবেণী, হালিসহর ও জিলা বারাশত এই তিন স্থানে মারীভয়ের অত্যন্ত প্রাবল্য হয়। এই তিন স্থানে তিনি [শ্রীকেশব] স্বয়ং চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঔষধপ্রেরণাদির কার্য্য তিনি নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে অতুল উৎসাহ যাঁহারা সে সময়ে দেখিয়াছেন তাঁহারাই অবাক্ হইয়াছেন।...

তিনি কেবল চিকিৎসক ঔষধাদি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া সেই সকল স্থানের উপকার সাধনের জন্য প্রেরণ করেন। যাহাতে উপযুক্ত মত অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তন্নিবারণ জন্য কি প্রকার পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হয়, সর্ব্বদা তাহার উপায় বিধানের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, কেশবচন্দ্র তাহা এই সময়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি একবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিবৃত্ত ছিলেন তাহা নহে, যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, জনসাধারণের দুঃখ বিপদ নিবারণের জন্য অতুলোৎসাহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।"

১৭৯৯ শকে যখন মাদ্রাজ প্রদেশের নানা স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার ফলে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে থাকে তখন শ্রীকেশবের আকুল আহ্বানে কলিকাতার নরনারিগণ এতদূর ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে একটা বিরাট্ সভায় কান্নার রোলের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে স্বর্ণালঙ্কার, টাকা, পয়সা, জামা, চাদর প্রভৃতি বর্ষিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ পর্য্যন্ত দয়াদ্রহৃদয়ে চাঁদা তুলিয়া অনেক টাকা সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছিলেন।

এখানে এই কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বিপন্ন দেশকে রক্ষা করার

উদ্দেশে দলগতভাবে কার্য্য করিবার পদ্ধতি শ্রীকেশবই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রবর্ত্তন করেন। একথা যে সত্য তাহা ভগিনী নিবেদিতা, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ইহাও বলিতে কুন্ঠিত হন নাই যে আজকাল এই যে সমাজ-সেবার মহাপ্রবাহ আর্য্য-সমাজ রামকৃষ্ণ-মিশন প্রভৃতির ভিতর দিয়া আসিয়া সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিতেছে ইহার আদি উৎপত্তি-স্থল শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নীরব প্রেম।

প্রেমের কাঙ্গাল শ্রীকেশবচন্দ্র একদিন নিভৃতে তাঁহার জীবন-দেবতার চরণ-কমল বক্ষে ধারণ করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—

"How deep and hidden is Thy love, O Lord! Who is more affectionate unto us than Thou art? Yet Thou keepest Thy heavenly love concealed from man, all the while most busily employed in providing for his good. ......Teach me to love my fellow-men with

a similar love of unexpressed depth, inwardly active for service, outwardly calm and unimpassioned—" Prayers.

ভগবান্ তাহার নবভক্তের এই প্রার্থনা যে পূর্ণ করিয়াছিলেন ভক্তের দৈনন্দিন জীবনই তাহার সাক্ষী।

শ্রীকেশবের প্রেম সত্যই বৈকুণ্ঠের গুপ্ত ধন। শুধু ব্রহ্মকৃপাগুণেই তিনি ইহা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। ইহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-রাজ্যের কোন সম্পর্ক নাই। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ইহার স্থিতি ও নিত্যক্রিয়া; যাহারা হৃদয়-পুরের অধিবাসী তাঁহারাই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন। স্থূল জগতের লোক কি বুঝিবে?

বনফুল লতায় পাতায় ঢাকা থাকিয়া নীরবে ফোটে এবং নীরবে সৌরভ বিস্তার করে, বনের পাখীরাই তাহা দেখিয়া আনন্দে গান করে; এবং ভ্রমরকুলই তাহার আঘ্রাণে প্রমত্ত হয়। শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রেমও ঠিক সেইরূপ;—নীরবেই হৃদয়-কুঞ্জে ফুটিত এবং নীরবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মৃদু হিল্লোলে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া আশেপাশের বিশ্বাসীবৃন্দকে মাতাইয়া তুলিত।

নীরব প্রেমের দৃষ্টান্ত।

এই নীরব প্রেমের কয়েকটী দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; এখানে আরও কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি।—

১। একটী দরিদ্র নববিধানপ্রচারক একদিন শ্রীকেশবকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মানন্দদেব একটু হাসিয়া তাঁহার প্রিয় ভাইটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

শ্রীকেশব ও ওল কচুর ব্যঞ্জন

"আমি যাহা ভালবাসি তাহা কি আহার করাইতে পারিবে?"

উত্তর হইল—"আপনি নিজেই তাহা বলিয়া দিলে ভাল হয়।"

কেশবচন্দ্র কৌতুক করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—

"আমি কেন বলিতে যাইব? তুমি নিজে বুঝিয়া তাহা প্রস্তুত কর।"

প্রচারক মহাশয় যারপরনাই ওল-ভক্ত ছিলেন; তিনি নিজে যাহা ভালবাসেন তাহা নিশ্চয়ই কেশবচন্দ্রেরও প্রিয় হইবে এই বিশ্বাস করিয়া ওলের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন। ব্রহ্মানন্দদেব তাহা দেখিয়াই আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার মনের কথা বুঝিয়াই বুঝি আজ এই ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইল?"

ফলাফলবিচার ত্যাগ করিয়া খুব অনুরাগের সহিত তিনি সেই ওলের ব্যঞ্জন আহার করিলেন। এইজন্য সেইদিন তাঁহার মুখ এমনই কুট্ কুট্ করিতেছিল যে যন্ত্রণায় ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। প্রচারক মহাশয় অত্যন্ত অপ্রতিভ ও দুঃখিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত তেঁতুল ও গুড় আনিয়া ব্যথা উপশমের

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধন্য শ্রীকেশবের প্রেম! তিনি নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়া তাঁহার প্রিয় অনুগামীর মনের দুঃখ যাহাতে দূর হয় সেইজন্য সুকোমল ও সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্যমুখে বলিয়া উঠিলেন,—

"আমি খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছি। তুমি আমাকে খুব খাওয়াও।"

বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার পরে দুইদিন পর্য্যন্ত তাহার মুখে ব্যথা ছিল। (ভাই মহেন্দ্রনাথের মুখে শ্রুত)

২। শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্মা দরিদ্র-জাতীয়। যতদিন তিনি সংসারে ছিলেন, তাঁহার মন সর্ব্বদা কাঙ্গালের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়াইত। পৃথিবীর বড়, ছোট, ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার কাছে আসিত, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই দরিদ্র-সহবাসে অধিক তৃপ্তি লাভ করিতেন। ("জীবন বেদের" চতুর্দ্দশ অধ্যায়—"জাতি নির্ণয়"—দ্রষ্টব্য)।

তিনি সতাই দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে যাইতে বড় ভালবাসিতেন। কাঙ্গালের স্পর্শে তাঁহার নীরব প্রেম যেরূপ উছলিয়া উঠিত সেইরূপ অন্য কিছুতেই হইত না। তপস্যার জন্য যখন তিনি কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূরে "সাধন কাননে" বাস করিতেন তখন মাঝে মাঝে গরীব

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে

কৃষকগণের ভবনে সহসা উপস্থিত হইয়া এমনি সহজ মর্ম্মস্পর্শী ভাবে প্রাণের ভালবাসা ও সহানুভূতি তাহাদিগকে দেখাইতেন যে তাহারা

সকলেই এই অযাচিত দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হইত। শ্রীকেশব নিজে আয়াস করিয়া কিছুই করিতেন না, স্বভাবের নিয়মেই হৃদয়ের আদান প্রদান সহজ ভাবে হইয়া যাইত। তাঁহার মুখের হাসি, আঁখির দৃষ্টি, দুই একটী মিস্ট কথা,—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই হৃদয়ের নীরব ভালবাসা অমৃত-ধারায় প্রবাহিত হইত। ইহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়ায় কাহার সাধ্য?

৩। অনেকেই অবগত আছেন যে বেলঘরিয়া তপোবন শ্রীকেশবের বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ স্থান ছিল। সেখানে তিনি দীন দরিদ্রের ন্যায় কালযাপন করিতেন। তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দর্শন করিয়া অনেকের মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইত। এখানে একটী মাত্র দৃস্টান্ত দিতেছি। এক দিন তিনি বেলঘরিয়া হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া অবতরণ করিলেন; তাঁহার গায় একখানা লক্ষ্ণৌ ছিটের বালাপোষ, পরিধেয়াদি নিতান্ত সাধারণ রকমের। একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাট্‌ফরমে তাঁহাকে দেখিয়াই অতি ভদ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আপনি কি চন্দ্র সেন?" যখন শ্রীকেশব একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ", তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "আপনি চন্দ্র সেন! সেই চন্দ্র সেন যিনি

ইংরাজ সেনাপতি এবং অকিঞ্চন বেশে শ্রীকেশব

মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন!" সৈনিক পুরুষের সম্ভ্রম ও বিস্ময়-মিশ্রিত ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গের বন্ধুগণ অবাক্ হইয়া গেলেন।

নববিধান যে দুঃখীদের বিধান তাহা শ্রীকেশবের নিম্নে উদ্ধৃত মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা হইতে পরিস্কার বুঝা যায়,—

"হে দীনবন্ধু, ধর্ম্মের শান্তভাব, দীনতার ভাব সকলকে দাও। দুঃখী আমরা যথার্থই। আমাদিগের নববিধান যে দুঃখীদের বিধান। আমরা দুঃখীর মত রাস্তায় চলিব, ধূলি হইয়া যাইব, দন্তে তৃণ করিব, তবে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইব।"—জীবনবেদ।

৪। পূর্ববঙ্গের নববিধানপ্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে একদিন তিনি শ্রীকেশবকে

ভাই দুর্গানাথের উপহার

কোন গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মানন্দদেব তখন এল্‌বার্ট কলেজের ক্ষুদ্র একটী প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া একাগ্রমনে লেখা পড়ার কাজ করিতেছিলেন। প্রচারক মহাশয় দূর হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল যেন এই ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-প্রকাশে পূর্ণ হইয়া আগুনের মত জ্বলিতেছেন! তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; বাহিরে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র কয়েক মিনিট পরে দৈবাৎ

পূর্ব্ববঙ্গের এই ভক্তটীকে দেখিবামাত্র এমনি স্নেহপূর্ণ নয়নে শান্তভাবে তাকাইলেন যে রায় মহাশয়ের প্রাণের সমস্ত ভয় এক নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল! তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমন্বয়াচার্য্যদেবের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিনীতভাবে আপনার নিবেদন জানাইলেন। শ্রীকেশব আদরের সহিত উপহার গ্রহণ করিয়া দুই একটী মধুর বাক্যে তাঁহার হৃদয় সুধাসিক্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্রের নীরব প্রেম স্বর্গের কি যে দুর্লভ বস্তু, ইহার আস্বাদ কত যে তৃপ্তিকর এবং ইহার যাদুপ্রভাব কেমন যে অমোঘ তাহার জীবন্ত প্রমাণ শ্রদ্ধেয় ভাই সেই দিবস পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

গৃহস্থ প্রচারক রাজেশ্বর গুপ্তের সাক্ষ্য

৫। চট্টগ্রামের গৃহস্থপ্রচারক পণ্ডিত রাজেশ্বর গুপ্তের নাম ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই শুনিয়াছেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে কমল-কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শ্রীকেশবচন্দ্র ভক্তগণসহ আহার করিবার জন্য বসিয়াছেন। সারি সারি কদলিপত্র মণ্ডলাকারে বিন্যস্ত, তাহার উপর সাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন; ভোজন আরম্ভ হইলেই হয়। এমন সময় চট্টগ্রামের প্রিয় অনুগামীকে সহসা আগত দেখিয়া শ্রীকেশব যারপর-নাই সুখী হইলেন এবং আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত মহাশয়

তখনও অভুক্ত আছেন বুঝিতে পারিয়া কতই আগ্রহের সহিত তাহার আহারের স্থান ঠিক করিয়া দিবার জন্য শিষ্যগণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, সকলেরই প্রাণ ক্ষুধায় অস্থির; আচার্য্যদেবের বাণী যে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যখন তিনি দেখিলেন যে কেহই তাঁহার কথা শুনিতেছেন না, তখন আপনার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং চট্টগ্রামের প্রিয় ভাইটীকে সেই আসনে যত্ন করিয়া বসাইলেন। নবভক্তকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দর্শন করিয়া শিষ্যগণ বড়ই লজ্জিত হইলেন। দুই এক জন অমনি ছুটিলেন, এবং নিমেষের ভিতরে কেশবচন্দ্রের জন্য অন্য স্থান প্রস্তুত হইল। ভোজনকার্য্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু একটী লোক সেদিন স্থির ভাবে আহার করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ তখন নীরব প্রেমের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হইতেছিল।

৬। শ্রীকেশবচন্দ্রের "নববৃন্দাবন" নাটক বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার অভিনয় প্রায়ই কমল-কুটীরে হইত; এই উপলক্ষে নানা শ্রেণীর বহু লোকের সমাগম হইত। একবার সাধারণ লোকের সংখ্যা এত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা দর্শকবৃন্দের সমস্ত বসিবার স্থান পূর্ব্বেই অধিকার করাতে রাজা, হাইকোর্টের প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পরে আসিয়া স্থান পাইলেন

শ্রীকেশবের বাড়ী সর্ব্বসাধারণেরই বাড়ী

না। ইহা দেখিয়া শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল আচার্য্যদেবকে বলিলেন,—

"এ বড় অন্যায়, যত বাজে লোক এসে বস্‌বার জায়গা দখল করে, আর বড় বড় লোকেরা বস্‌তে পাননা; এবার যাতে বাজে লোক ঢুক্‌তে না পায় তার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে"

এই কথা শুনিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, তারা যদি প্রাচীর টপ্‌কে ঢোকে?"

উত্তর হইল,—

"তাহলে তাদের পুলিশে দেওয়া হবে।"

বিশ্বপ্রেমিক কেশব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"যদি সেখানে গিয়া তাহারা বলে, আমরা নিজের বাড়ীতে ঢুকেছিলাম?"

ভাই অমৃতলাল ইহা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। শ্রীকেশবের বাড়ীতে সমস্ত লোকেরই যে সমান প্রবেশাধিকার এটা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

(১৩৩১ সালের ১লা অগ্রহায়ণের "ধর্ম্মতত্ত্বে" উল্লিখিত)

কেশবচন্দ্রের প্রেম নীরব হইলেও কত উদার ও গভীর!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দল সাধন।

"দল" বলিতে কি বুঝা যায় তাহা শ্রীকেশব এই ভাবে ব্যাখা করিয়াছেন,—

"যদি বস্তু অতি গুরু হয় তাহা চূর্ণ করিবার জন্য ঘনীভূত বলের প্রয়োজন। এই জন্য পৃথিবীর নাস্তিকতা এবং অধর্ম্ম নিতান্ত অধিক হইলে ঈশ্বর নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মবলকে একস্থানে আনিয়া সম্বদ্ধ ও ঘনীভূত করেন। এই ঘনীভূত বলের নামই "দল"। সেই দলের ভিতরে রাশি রাশি ব্রহ্মতেজ ঘনীভূত হয়; যেন এক স্থানে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সেই প্রকাণ্ড অগ্নির মধ্যে পড়িয়া পৃথিবীর সমস্ত পাপ অধর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়।"— আচার্য্যের উপদেশ

নববিধানের অদ্ভুত দল এই ভাবেই উদ্ভুত হইয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নববিধানের প্রেরিতবর্গ এবং প্রচারক ও সাধকগণকে নিয়াই এই দল প্রধানতঃ গঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অভিনব সেবক-মণ্ডলীর নাম রাখিয়াছিলেন "ব্রহ্মানন্দী দল"। মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, ঋষি গৌরগোবিন্দ, "মৌলানা" গিরীশচন্দ্র, প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথ, সেবক কান্তিচন্দ্র, বিশ্বাসী উমানাথ, বৈরাগী প্যারীমোহন, ভক্ত-

কর্ম্মী অমৃতলাল, উপাচার্য্য দীননাথ ও বঙ্গচন্দ্র, গৃহস্থ-প্রচারক কৃষ্ণবিহারী, প্রকাশচন্দ্র, হরিসুন্দর প্রভৃতির নাম সর্ব্বজন-পরিচিত। প্রতাপচন্দ্র কতবারই বলিয়াছেন যে তিনি এই রূপ একটী অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দল পৃথিবীর কোথাও আর দেখেন নাই। এই দল কেশবচন্দ্রের মহাসাধনার ফল। ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে আভাসে একাধিক বার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দলের কি রহস্যময় যোগ ছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার দুই একটী কথায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি একদিন কমল-কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শ্রীকেশব যোগ-মগ্ন প্রাণে নববিধানের নূতন তত্ত্বকথা কহিতেছেন, এবং প্রেরিতবৃন্দ ও প্রচারকগণ তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিতেছেন। তিনি এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়াই মধুর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

দলের মধ্যবিন্দু

"বা! এ যে স্বর্গের সুন্দর আলোক-ঝার দেখ্‌ছি; মাঝ্‌খানে একটী প্রকাণ্ড আলো, আর চরিদিকে ছোট ছোট অনেক আলো!"

(সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

ঈশ্বর যে শ্রীকেশবকে মধ্য-বিন্দু রূপে ধরিয়া নববিধানের দল রচনা করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরের এই সাধু পুরুষ কি আশ্চর্য্য ভাবে তাহারই সাক্ষ্য দান করিলেন! যিনি সত্য-

রাজ্যের অধিবাসী তিনি কেমন করিয়া অস্বীকার করিবেন যে ব্রহ্ম-জ্যোতি নিরন্তর শ্রীকেশবের ভিতর দিয়াই তাঁহার দলকে আলোকিত করিত ?

শ্রীকেশব আপনাকে কোন্ অর্থে দলের "মধ্যবিন্দু" বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত প্রার্থনা হইতে অনেকটা বুঝা যায়,—

"হে দীনজনপ্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে ; তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা নববিধানের তাৎপর্য্য। বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা হউক না হউক, একজনমধ্যবিন্দুতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে।—দৈনিক প্রার্থনা (৩১।১০।৮২)

দলের সঙ্গে তাঁহার এই নিত্য নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা মনে করিয়াই শ্রীকেশব ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন,—

স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্তপদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।......হে ঈশ্বর, ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত ; এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।"

(দৈনিক প্রার্থনা, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৮৮২)

মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ নবযুগধর্ম্মবিধানের ভিতর দিয়া সমস্ত মানবজাতির একত্ব সাধনের জন্য যাঁহাকে "সদল অখণ্ড" রূপে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি যে দলকে আত্মস্থ করিয়া এবং আপনাকে দলের মাঝে হারাইয়া ফেলিয়া মহাসাধনায় মগ্ন হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীকেশবের বিশ্বাস ছিল যে দলের সকলে যদি এক দিকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অন্য দিকে পরস্পরের সঙ্গে প্রেম ও পুণ্যেতে এক হইয়া একটী শুদ্ধ উদার ভ্রাতৃমণ্ডলীর আদর্শ পৃথিবীতে দেখাইয়া যাইতে পারেন তবেই নববিধানের মহামিলন-ভূমিতে এক জাতি ও এক পরিবার গঠনের সূত্রপাত হইবে। এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ প্রবল ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে উদ্ধৃত প্রার্থনা হইতে পাওয়া যায় ;—

আদর্শ ভ্রাতৃমণ্ডলী

"দীনদয়াময়, প্রেমসিন্ধু, তোমারি লোক আমরা, তোমারি সাক্ষী আমরা। আমাদের দেখিয়া লোকে ভাল হইবে এই তুমি চাও। আমাদের চরিত্র দেখিয়া লোকে নববিধান পাঠ করিবে।...দয়াময়ি, ইহাঁদিগকে খাঁটি করে দেও। ইহাঁরা খাঁটি না হইলে তোমাকে কেহ চিনিবে না; আমার প্রিয়তম ধর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। খাঁটি না হইলে পাহাড়ে আসা মিথ্যা, যোগধর্ম্ম করা মিথ্যা।...প্রেম পুণ্য শান্তি দেও, আমরা এক এক জন পৃথিবীর কাছে দাঁড়াইব, পৃথিবীর লোকে দেখিয়া বলিবে, এই কয়টী লোক যেমন ঠিক মার একখানি পরিবার।"—প্রার্থনা (২৮।৫।৮৩)

শ্রীকেশবের দল যাহাতে পুণ্যেতে একত্ব লাভ করিতে পারে সেই জন্য তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্‌টেম্বর এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

পুণ্যে একত্ব

"যে তোমার মত সে আসল তোমার। তোমার স্বভাবটী আমাদের দাও। তোমার যে উজ্জ্বল তেজ ঐ তেজ আমাদের হউক। দেবী, পুণ্যদানে ভক্তদলকে তোমার করিয়া লও। পুণ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে যে তোমার সহিত মিলন, সে এই আছে এই নাই।...তোমার সহিত পুণ্যে এক হইয়া যথার্থ একত্ব তোমার সহিত স্থাপন করিব।"—প্রার্থনা (২০।৯।৮০)

দলের ভিতর যাহাতে পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রস্তুত হইতে পারে সেই জন্য শ্রীকেশব সর্ব্বদাই ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার জীবন-দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার একটী প্রার্থনা আংশিক ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

পবিত্র জীবনের আদর্শ

"হে পিতা, তোমার স্বর্গীয় বাতাস প্রেরণ কর। তোমার পবিত্র নিশ্বাস আমাদের ভিতর প্রবেশ করাও। হৃদয়ে সেই নিশ্বাস সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হউক। পবিত্রতাকে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতে দাও। আমাদের ভিতরে পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রস্তুত করে দাও।"—(দৈনিক প্রার্থনা—১৪।১১।৮০)

শেষ জীবনে শ্রীকেশবের প্রাণের একমাত্র সাধ ছিল যে তাঁহার দলটী সত্য, প্রেম ও পুণ্য, এই তিনের মিলনে গঠিত

হইয়া নববিধানের আদর্শ পরিবার রূপে প্রতিভাত হয়। দলস্থ প্রত্যেকের দেহটী পর্য্যন্ত যাহাতে ভাগবতী তনু রূপে ফুটিয়া উঠে সেই জন্য তিনি ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া কতই কাঁদিয়াছেন। ঐ শুন তিনি কি বলিতেছেন,—

"হে প্রেমময়, হে গুণের সাগর, সাধু মন অসাধু তনু বহন করিতে পারে না। শরীর যদি পাপ অন্ধকারে মলিন থাকে তবে মন কি আর ভাল হইবে? হে দীননাথ, ব্রহ্মতনুর শ্রষ্টা, ভাগবতী তনু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুবা এই শরীরের দুর্গন্ধ লইয়া আর চলিতে পারা যায় না। অন্তরের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। জননীর সৌরভ সন্তান-তনুতে দাও। তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিলিল, তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক হইল। এই জন্য, দেহপতি, তব পদে মিনতি যে এই দেহকে তব কৃপায় শুদ্ধ করিয়া দেও। হে তেজোময়, তোমার প্রসাদে এই দেহকে আমাদের আনন্দের বস্তু করিতে দাও। এই দেহ সমস্ত পবিত্র বস্তুর মিলন-স্থান হউক। যত শাস্ত্রের মিলনে দেহ-শাস্ত্র হউক।"—

দলের ভাগবতী তনু

দৈনিক প্রার্থনা (৫।১০।৮২)

সদলে পবিত্রাত্মা পরমেশ্বরের সাধনা এই ভাবে পৃথিবীর আর কেহ কোন দিন করিয়াছেন কি? শরীর, মন ও প্রাণ এক সঙ্গে শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়া ভগবান্ এবং সাধুভক্তগণের লীলা-ক্ষেত্র হইবে, ইহাই ছিল এই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সম্পর্কে "সাধন-কানন" ও "বেলঘরিয়া তপোবন" চিরকাল সাক্ষ্য দান করিবে।

শ্রীকেশব তাঁহার দলকে কি যে স্নেহ, মমতা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহার আভাস ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে; বিশ্বাস ও ভালবাসার এইরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত যুগে যুগে দুই একটী মাত্রই পাওয়া যায়। কেশবচরিত্র বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা, এই তিন স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত। ইহারই আদর্শে সংসারে একটী দল খাড়া করিয়া ঈশ্বরের প্রেমপরিবার যে কি বস্তু তাহা দেখাইয়া যাওয়া তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল। তিনি সমস্ত হৃদয়ের সহিত এই ইচ্ছা করিতেন যে দলের সকলেই শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে ও ভালবাসিবে। কোন সময়ে ইহার অন্যথা হইলে তাঁহার কি যে দুঃখ ক্লেশ হইত তাহা বর্ণনাতীত। নববিধানের উপাধ্যায় ঋষি গৌরগোবিন্দের মুখে আমি শুনিয়াছি যে যখনই দলের ভিতরে অসদ্ভাব ও অপ্রীতি দেখা দিত তখন তাঁহার কোমল হৃদয় শত শত ক্রুশে বিদ্ধ হইত; রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইত না, শয্যাতে পড়িয়া তিনি কেবল এ পাশ ও পাশ করিতেন! দলের অপরাধের জন্য তিনি নিজে কতবার কত ভাবেই যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন পৃথিবী তাহা এখন পর্য্যন্তও জানিতে পারে নাই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দলের ভিতরে বিরোধের ভাব দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রচারকবর্গকে লিখিয়াছিলেন,—

দলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত

"আমাকে এবং বর্ত্তমান বিধানকে ছাড়িবার জন্য তোমরা যে সকল আয়োজন করিতেছ তাহাতে আমি চমৎকৃত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার দিন তোমাদের মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি! আচ্ছা! আমি প্রভুর আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীত ভাবে জানাইতেছি। তাঁহার আদেশ—তোমাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। অবশ্যকর্ত্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটী পালন করিবে। ......যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। আমার ঐ দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব।"

অল্প কয়েক দিন পরেই শ্রীকেশবকে যে বাস্তবিকই এই "দণ্ড" ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য ঋষি গৌর-গোবিন্দ দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সায়ংকালে [১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মাঘ] কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ ত্রিতল গৃহে তাঁহাকে লইয়া প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট। কেশবচন্দ্রের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাঁহার বন্ধু-গণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎসবে তিনি কার্য্য করিতে পারেন নাই সেই কারণেই বর্ত্তমান উৎসবেও তিনি কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে যে অসদ্ভাব আছে তাহা মিটাইয়া লন তাহা হইলে তিনি উৎসবে

কার্য্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের ন্যায় সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, কিন্তু কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সদ্ভাবের দিকে এক পদ অগ্রসর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যখন তাঁহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্দ্র সভাস্থল হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাণ্ডায় গেলেন। তিনি কেন দ্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া দ্বারের একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাদুকা লইয়া আপনাকে প্রহার করিতেছেন!...এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আকুল হইল, তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সকলে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এই ঘটনা সকলেরই মনে কার্য্য করিতেছিল।"

শ্রীকেশব এই যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মাঘ তাঁহার দলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তাহার ফল হইল অতি অদ্ভুত। সমস্ত বিরোধ ও অমিলনের ভাব দল হইতে দূরে পলায়ন করিল এবং এক অসাধারণ উদার প্রেম স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের প্রাণ মনকে এক করিয়া দিল। শ্রীকেশব ১১ই মাঘ টাউনহলে "Behold The Light of Heaven in India" বিষয় অবলম্বনে চিত্তোন্মাদক স্বরে নববিধানের আগমন বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিলেন!

দলের সঙ্গে শ্রীকেশবের প্রকৃত যোগ কোথায়, তাঁহাকে পাইবার উপায় কি, দল ছাড়া তাঁহার যে কোন অস্তিত্বই নাই, দল এবং তিনি যে একজন এবং সমুদয় লইয়া যে নববিধান, তাহা এবং আরও অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া তিনি হিমালয় হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ভক্ত উমানাথের এক পত্রের এই উত্তর দিয়াছিলেন,—

"আমার সঙ্গে যোগ আছে কিনা ইহা আমার বলা ঠিক নহে। এই কথাটীতো আমার উত্তর সাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে সেইখানে আমি। আমার সহিত গূঢ় যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি সেই রূপ দর্শন করিতে হইবে। দলছাড়া আমি একজন আছি ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি একজন, সমুদয় লইয়া নববিধান। একটী লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার। প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতকে দর্শন, ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া পরস্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দল ছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই।"

তৃতীয় স্কন্ধ।

ভক্তি-মঙ্গল।

" আহা! মা! ভক্তিতে মাতিলাম। খুব মাতাও; ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে।"—জীবনবেদ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভক্তিসঞ্চার।

সমন্বয়াচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের ভক্তি যে ধর্ম্মজগতে এক অভিনব বস্তু, ইহা যে বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনের দৈব সংযোগের ফল, সংশ্লেষ যে ইহার প্রকৃতি এবং সামঞ্জস্য যে ইহার প্রাণ, কেশবজীবনে ইহার প্রকাশ ও বিকাশ যে সম্পূর্ণরূপে নবধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত তাহা মৎপ্রণীত "শ্রীকেশব-সমাগম" গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

বাস্তবিকই কেশবজীবন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁহার হৃদিস্থিত উদার প্রেম যখন বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সংস্পর্শে গভীর হইতে গভীরতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইয়া বিশ্বানুরাগের আকার ধারণ করিল, তখনই অমৃতময়ী ভক্তি-গঙ্গা সহস্র ধারায় অবতরণ

করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মসাগরসঙ্গমপানে ভাসাইয়া নিয়া চলিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার কেমন করিয়া একমাত্র দৈনন্দিন ব্রহ্মোপাসনার যাদুপ্রভাবে সজ্ঘটিত হইল তাহারই স্থূল বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইবে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ব্রহ্মানন্দচরিত্র ব্রহ্মকৃপা ও ব্রহ্ম-সাধনার মিলন-ফল, এবং ব্রাহ্মসমাজের জীবন বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা ব্রহ্মানন্দজীবনের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ক। "শুষ্ক বালুকার" পথে।

নবভক্তিসঞ্চার সম্পর্কে শ্রীকেশব বলিয়াছেন,—"কোন্ পথ ধরিয়া শুষ্ক বালুকার মধ্য দিয়া কোন্ পাহাড়ের ধার দিয়া এই ভক্তি-সরোবরের তীরে আসিলাম, ঠিক নির্ণয় করিয়া আসি নাই।" —জীবন বেদ।

ইতিহাস কিন্তু ইতিমধ্যে তাহা অনেকটা নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীকেশব ১৮৮৭ শকের আরম্ভে কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হন, এবং "অন্তরে বাহিরে কেবল বিবেকসাধন, বিশ্বাসবৈরাগ্যসাধন" করিতে করিতে দারুণ দৈন্য ও শঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ১৮৮৯ শকের শেষ ভাগে ভগবানের বিশেষ কৃপায় সুখের ভক্তিরাজ্যে সদলে প্রবেশ করিলেন। এই দুঃখময় দীর্ঘ প্রবাসের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবানুচর শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি-লিপিতে বলিয়াছেন,—

"কলিকাতাব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কিছুদিন অত্যন্ত কষ্ট ও দুরবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথবা গৃহহীন মনুষ্যের ন্যায় কিছুদিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে বন্ধুসকলের সঙ্গে সমবেত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান ছিল না। ৩০০ নং চিৎপুর রোডস্থ ভবন—যেখানে আমাদিগের কলিকাতাকলেজের কার্য্য হইত, সেই ভবনটী আমাদিগের একমাত্র প্রকাশ্য স্থান ছিল। প্রকাশ্য সভা করিতে হইলে প্রাঙ্গনে তাঁবু খাটাইয়া করিতে হইত। কোন ক্ষুদ্র সভা করিতে হইলে এই গৃহের উপরকার একটী ঘরে হইত। সকলে বসিয়া এক দিন স্থির হইল যে, প্রতি রবিবারে প্রাতে এই স্থানে প্রকাশ্য উপাসনা হইবে। প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু এই স্থানটী এরূপ প্রশস্ত ছিল না যাহাতে রীতিমত অধিক লোক লইয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, সুতরাং কেবলমাত্র আমাদের খুব নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব লইয়া এখানে উপাসনা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এ উপাসনায় যাইতেন না। এক এক জন প্রচারক এখানকার উপাসনা করিতেন। ······এই সময় হইতে যতদিন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের গৃহে দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা হয় নাই, ততদিন আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ক্রমে এই দুর্দ্দশা এতদূর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল যে অনেকেরই মনে সূক্ষ্ম ভাবে অবিশ্বাস ও সংশয় আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের এবং অপরাপর সকলেরই আশঙ্কার কারণ হইল। বন্ধুবিশেষের নিরাশাসূচক অনুযোগে সময়ে সময়ে কেশবচন্দ্রের যে প্রকার বিষাদ উপস্থিত হইত, তাহা স্মরণ করিলে আজও ক্লেশ হয়। এমন কি এই বিষাদে তাঁহার গৌরদেহ বিবর্ণ হইত। ......যেমন নিদারুণ গ্রীষ্মের যন্ত্রণা বর্ষাকালের বৃষ্টিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগবানের অপূর্ব্ব কৌশলে কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা আসিয়া সমস্ত শুষ্কতা ও সংশয় অপনীত করিয়াছিল। সে যাহা হউক, এই দুরবস্থার মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নির্ভরের স্থান ছিলেন। তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া, আমরা সকল পরীক্ষা দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেশবচন্দ্রের ভাব আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল।"

মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় বিশ্বাসী পুরুষের মনও যে এই "শুষ্কতা ও সংশয়ের" আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই তাহা তিনি এক চিঠিতে শ্রীকেশবকে পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। এই পত্রের আরম্ভে তিনি এই ভাবে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"যে কোন স্থানে আমি থাকি না কেন, আমার নিকটে সব সমান। রোদন আবেদনে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এজন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু হৃদয়ের পূর্ণতা হইতে মুখ কথা কয়। মনে হয়, সর্ব্বথা

বিনাশ বা উদ্ধার বিনা আর কিছুতেই আমার উপকার সাধন করিতে পারে না। ইহাকে অধৈর্য্য বলা যাইতে পারে। ভাল কাজে ধৈর্য্য ভাল, মন্দ কার্য্যে ধৈর্য্য কি ভাল? ধৈর্য্যাপেক্ষা অধৈর্য্য কি কোন সময়ে ভাল নয়? আমার এই দুরাত্মা আত্মার সঙ্গে আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারি না। —(অনুবাদ)

এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে প্রতাপচন্দ্র শ্রীকেশবের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পত্র এইভাবে শেষ করিয়াছেন,—

"কিন্তু সময় বহিয়া যাইতেছে—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। সে কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে, যে মৃত্যুমুখে নিপতিত? এক দিনের শ্রমের উপরে অনন্তকাল ঝুলিতেছে। তবু আমি নিদ্রিত, তবু আমি যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব, হয় এখন. নয় আর কখন নয়। আমাকে মুক্ত কর, কোথায় এবং কিসে মুক্তি আমায় বল। জীবনের সমগ্র কাজ সম্মুখে লইয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই দুঃখভারগ্রস্ত অধঃপতিত পাপীকে ঈশ্বর করুণা করুন।"—(অনুবাদ)

(From "The Faith And Progress Of The Brahmo Somaj" by P. C. Mazumdar.)

এই পত্রের উত্তরে শ্রীকেশব (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন) প্রতাপচন্দ্রকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ;—

"আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আমার সন্দেহ, তোমার চিত্তের বর্ত্তমান অস্থিরতার অবস্থায় আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার সন্তুষ্টি হইবে কিনা।.........আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন হইতেছে, এই বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর এবং ক্লেশকর; বিপদ ও ক্লেশ আরো বাড়ে, যখন মুক্তি সম্পর্কে নিরাশা উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমি কি জান না ঈশ্বরের স্নেহ অনন্ত, এবং অতি অধম পাপীকেও তিনি পরিত্রাণ করেন? তাঁহার করুণার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর, অবসন্ন হইওনা.........

"প্রিয় বন্ধু, প্রতি দিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাসে ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। এক দিন ঈশ্বর এমন আত্ম-প্রকাশ করিবেন যেমন আর কখনও করেন নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশা নাই। তাঁহার করুণা পাপের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াও পুণ্য-নিলয়ের পথ খুলিয়া দেয়।"—(অনুবাদ)

(From "The Faith And Progress Of The Brahmo Somaj" by P. C. Mazumdar.)

কয়েক মাস পরে (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীকেশব করুণার্দ্র হৃদয়ে প্রতাপচন্দ্রকে আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা এখানে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম-রাজ্যে ইহার মূল্য কত যে বেশী তাহা তত্ত্ব-পিপাসু পাঠকগণ নিজেরাই বুঝিয়া লউন।—

"প্রিয় প্রতাপ! আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের বিষয় তুমি অভিযোগ করিয়াছ। তোমাকে বর্জ্জন! কে বলিল? নিশ্চয় জানিও, তোমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের নিমিত্ত আমি আমার হৃদয় মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি; আমি যে তোমার কল্যাণপ্রার্থী তদ্বিষয়ে বিশ্বাসী হইয়া তথায় অবস্থান কর। তোমাকে রাখিব কি পরিত্যাগ করিব সেরূপ স্বাধীনতা আমার নাই। যে কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বর আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে চাকরের মত সেবা করিতে আমি বাধ্য। পিতার নিকটে তোমাদিগকে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা এবং সকলকে ভালবাসা আমার জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতাপ, আমি ভাড়াটে নই। আমার ব্যবহারপ্রণালীর বিষয় কেহ যেন কিছু মনে না করেন। কারণ চিকিৎসক যেমন রোগীর অভাবানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করে আমিও তেমনি করিয়া থাকি। রোগ আরোগ্য করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। যে পরীক্ষা এবং সংগ্রামের পেষণে তুমি ভারাক্রান্ত হইয়াছ তাহা কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য্য এবং আশার সহিত বহন কর, কেননা তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য......পরীক্ষা বিপদের ভিতর দৈব কার্য্যের রহস্য লোকে বুঝিতে পারে না এবং চায় না; সেই জন্য তাহারা না বুঝিয়া সন্দেহ এবং নৈরাশ্যে পড়িয়া সচরাচর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত যদি চলিয়া যায়, তথাপি তুমি বিশ্বাস এবং আশাকে নিশ্চয় পোষণ করিবে। বিধাতার উপর নির্ভর

এবং ভাল হওয়ার আশা যদ্দারা পরীক্ষিত হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। ঈশ্বরের পথ করুণার পথ, পরীক্ষার সময়ে ইহা স্মরণে রাখিবে।”

একাধারে স্বর্গীয় বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার কি অদ্ভুত প্রকাশ!

খ ভক্তি-গঙ্গার উপকূলে।

যিনি আশার প্রদীপ হাতে করিয়া বিশ্বাসাত্মা পুরুষ রূপে সংসারে আসিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাস ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবিরাম পুণ্য-নিলয়পানে ছুটিতেছিলেন, সংশয় ও নিরাশা তাঁহার কি করিবে? দলের ভিতরে যতই অবিশ্বাসের অন্ধকার তাঁহার নিজের প্রাণে ততই ব্রহ্মপ্রকাশের বিমল আলো! তিনি প্রতাপচন্দ্রপ্রমুখ সাধকগণকে শুধু আশার বাণী শুনাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উপস্থিত শঙ্কট হইতে তাঁহার দলকে উদ্ধার করার মানসে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের গৃহে দলগতভাবে দৈনিক সাধন ভজন আরম্ভ করিলেন। এই নিত্য উপাসনার গুণে কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহা প্রতাপচন্দ্র এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

“আহা! তাঁহার [কেশবচন্দ্রের] প্রার্থনার কি স্বর্গীয় ভাব! আমি এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

আমি উত্তর পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। উপাসনার মধ্যে যে স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া গিয়াছিলাম আমার অবর্ত্তমান সময়ে তাহা আরও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে। যথার্থই বিধানের আরম্ভ।...নিরন্তর প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপাসনা, ধ্যান চলিয়াছে। যাহা আমি দেখিলাম তাহাতে পবিত্র হইলাম, আনন্দিত হইলাম। বিশ্বাস ও প্রেমের স্বর্গীয় ভাব দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমরা প্রতিজনই নবজীবনের অভ্যুদয় অনুভব করিতেছি। কোন একটী পবিত্র মহান্ বিষয়ের ইটি আরম্ভ। চতুর্দ্দিকের অন্ধকার ও নিরাশার মধ্য দিয়া যথা সময়ে ভগবানের শুভসংবাদের আলোক ঠিক প্রণালীর ভিতর দিয়া অবতরণ করিয়াছে।"— (অনুবাদ)

("The Faith And Progress Of The Brahmo Somaj by P. C. Mazumdar).

এই সমস্তই সম্ভব হইল একমাত্র দৈনিক উপাসনার মাহাত্ম্যে। ঐ যে শ্রীকেশব তাঁহার মৃতপ্রায় দলটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া দীনহীন ভিখারীর বেশে ভগবানের দুয়ারে "ধন্না" দিলেন, এবং ভক্তদলের মঙ্গলোদ্দেশে দিনের পর দিন আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসলের সাধ্য কি যে তিনি এই অন্তরভেদী কান্না ও দীর্ঘনিশ্বাস শ্রবণ করিয়া অবিচলিত থাকিবেন ? ভক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং ভক্তি-গঙ্গার আকারে প্রবাহিত হইয়া ভূতলে অবতরণ করিল। ইহার

ফল হইল সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের নবজীবন লাভ। শুষ্ক নীরস ভাব আর কোথাও রহিল না; ভক্তির অমৃতসলিলে অভিষিক্ত হইয়া বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মগণের মরুভূমিতুল্য হৃদয় ফলফুলশোভিত মনোহর উদ্যানে পরিণত হইল। শ্রীকেশবের তখন আনন্দ দেখে কে? তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়জনদের নিয়া—

"প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ ভক্তি-নদীর উপকূলে,
হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন পুণ্য-সম্বলে।
অমর হয়ে অমৃত পান করিলেন কুতূহলে,
ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সুখে ভাসিলেন প্রেম-হিল্লোলে।"

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। শ্রীকেশবের আপনার বলিয়া সংসারে কিছুই ছিল না, কেননা তিনি নিজকে নিখিল মানবমণ্ডলীর সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন; তাই যাহা কিছু তাঁহার নিজের হাতে আসিত সমস্তই সর্ব্বসাধারণের দখলে গিয়া পড়িত। "ভক্তি-সমাগম" সম্পর্কেও তাহাই হইল।

আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে যখনই ঈশ্বর শ্রীকেশবের প্রাণে একটী নূতন ভাবরাজ্য খুলিয়া দিতেন তখনই কোথা হইতে সেই সময়ের উপযোগী লোক সকল আবশ্যকীয় উপকরণ সহ অযাচিত ভাবে শ্রীকেশবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মসমাজে শ্রীকেশবকে মধ্যবিন্দু করিয়া একটী অভিনব ভক্ত-দলের আবির্ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে

মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির আগমন এই ভাবেই হইয়াছিল।

বিংশ অধ্যায়।

"সোণার মুঙ্গের।"

কেশব-জীবনের মধ্য দিয়া কি ভাবে ব্রাহ্মসমাজে নবভক্তির সমাগম হয় তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই ভক্তি দেব-নিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া আশ্চর্য্য ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন বন্যার আকার ধারণ করিল তখন ইহার বিশাল তরঙ্গ শুধু কলিকাতা নয়, শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিল, এবং অচিরে সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডবাসিগণের জড়ভাবাপন্ন প্রাণকে জাগাইয়া তুলিল। তাঁহারা অনেকেই পরিত্রাণের সুসমাচার লাভের জন্য আশাপূর্ণ মনে সতৃষ্ণ নয়নে ভারতের পানে তাকাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের মধ্যে এক জন (সুবিখ্যাত ডাক্তার নরম্যান্ ম্যাক্লিয়ড্) শ্রীকেশব ও তাঁহার দলকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"যখন আমি ঐরূপ অটল ভক্তিবিশ্বাসের সংবাদ পাইলাম, তখন কি আর সংসারে পড়িয়া থাকিতে পারি? আমি কি

আর উত্থান করিয়া আমাতে এবং অন্য সকলের ভিতরে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দর্শন করিব না? হে উদার-হৃদয় ব্রাহ্মগণ, আপনারা দেহমনপ্রাণ দিয়া নিষ্ঠার সহিত যে মহত্তম কার্য্যসাধনে আয়াস স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে কেবল আপনাদের বা আপনাদের দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা মনে করিবেন না। আপনারা কি করিতেছেন যাই আমি শ্রবণ করি অমনি আমার আত্মা আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। আমি তো বিশ্বাস করিবই, আপনারাও বিশ্বাস করুন যে সমুদ্রের পূর্ব্বকূল হইতে আমার নিকট পরিত্রাণ আসিয়া সমুপস্থিত।......

"আপনারা যাহা করিতেছেন কালের ভিতর দিয়া উহার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকিবে, এবং যাহা কিছু সত্য ও পবিত্র তৎসহকারে উহা চিরকাল সংযুক্ত থাকিবে।"

(অনুবাদ)

দেশবিদেশ হইতে এই ভাবের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া শ্রীকেশব বর্ত্তমান সময়কে নবভক্তিপ্রচারের পক্ষে অনুকুল মনে করিলেন, তাই কলিকাতায় আর বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভারতের নানাস্থানে নবধর্ম্মামৃত বিতরণ করিতে করিতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র নগর ধর্ম্ম-জগতে নবভক্তিতীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চলিল।

ক। মুঙ্গেরে অপূর্ব্ব ভক্তি-লীলা।

সাধু অঘোরনাথ ঈশ্বরাদেশে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়া ভক্তিসমাগমের পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। মুঙ্গেরবাসীর মন যাহাতে বিষয়-সুখ ভুলিয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় সেই জন্য তিনি ব্যাকুল চিত্তে গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক একান্ত নিষ্ঠার সহিত হরিনামকীর্ত্তন প্রার্থনাদি করিতেন। তাঁহার মুখে মধুর ব্রহ্মতত্ত্বকথা শুনিয়া অনেকেরই চিত্ত গলিয়া যাইত। দিবা নিশি সাধনভজন সৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। ইহার ফলে কয়েকটী লোক সত্যধর্ম্মের নবজীবন-প্রদ আলোক লাভের জন্য লালায়িত হইলেন। সাধুসঙ্গে হরি-প্রসঙ্গ ও হরিনামসাধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে মুঙ্গেরে একটী ক্ষুদ্র ভক্ত-মণ্ডলী প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্য-বিন্দু হইলেন সাধু অঘোরনাথ।

এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীকেশব সেখানে গিয়া যখন উপস্থিত হইলেন তখন অঘোরনাথ ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে ব্রহ্মোৎসবের বিরাট্ আয়োজন হইল। অতি প্রত্যূষ হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সমস্ত সময় ব্রহ্মনামকীর্ত্তন ও নৃত্য, উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি এমন জমাট ও জীবন্তভাবে সম্পন্ন হইল যে সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যেন ভূতলে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছে। শ্রীকেশবের

উপদেশে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভক্তি-সিন্ধু উদ্বেলিত হইল। প্রাণের আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া অনেকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ যে কি বিস্ময়কর ব্যাপার তাহা বর্ণনাতীত। সত্যই মরা গাঙ্গে বান ডাকিল!

উৎসবের দিন হইতে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীকেশবের গৃহে প্রত্যহ মিলিত হইতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্ম সমাধা করিয়া কতক্ষণে তাঁহার কাছে যাইতে পারিবেন সেইজন্য তাঁহাদের সকলের মন সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকিত। কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে শ্রীকেশবের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেন। সেখানে সদালাপ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা ইত্যাদিতে রাত্রির অনেকটা সময় অতিবাহিত হইত। কোন কোন সময়ে রজনী প্রভাত হইয়া যাইত। হরিনাম-মদিরা পানে মন প্রমত্ত থাকিলে যে দৈহিক দুঃখ যন্ত্রণা সম্পর্কে কোন অনুভূতি থাকে না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে সময়ে পাওয়া গিয়াছে। এক দিন যখন প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল তখন একটী বিশ্চিকের দংশনে কোন বিশ্বাসীর অঙ্গুলীতে রক্তপাত হয়, তিনি তাহাতে একটুও বিচলিত না হইয়া ক্ষতস্থানে ভক্তগণের পদধূলি ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আবার হরিনামগানে মগ্ন হইলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া ব্রহ্মসাধনায় ডুবিয়া থাকা এই ভক্তদলের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মুঙ্গেরের পীরপাহাড় সাধনভজনের পক্ষে একটী অতি সুন্দর স্থান। ছুটীর দিনে অতি প্রত্যুষে ভক্তদল সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শান্ত সমাহিত চিত্তে সেই পাহাড়ে আরোহণ করিতেন এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মধুর ব্রহ্মোৎসবে মত্ত থাকিতেন। কেহ কেহ সমস্ত রাত্রি সেই নির্জ্জন সাধন-ভূমিতে ধ্যানে মননে অতিবাহিত করিয়া উষার আগমনে হৃদয়ে শান্তি ও বদনে প্রসন্নতা নিয়া "প্রভাতী" গাইতে গাইতে পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেন। রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে উপাসনান্তে যে ব্যাপার উপস্থিত হইত তাহা বড়ই অদ্ভুত। মন্দির হইতে রাজপথে নামিয়াই ভক্তদলের পদধূলি লইবার জন্য মহা হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইত। একটী সামান্য সাধকও পদধূলি না দিয়া কোন মতেই চলিয়া যাইতে পারিতেন না। সত্যই যেন পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই অসম্ভব ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল একমাত্র কেশব-চরিত্রের অলৌকিক প্রভাবে।

প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথ মুঙ্গেরে ভক্তির উচ্ছ্বাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"ভক্তির অনেক বিচিত্র ব্যাপার এই স্থানে দেখা গিয়াছে। তৎকালে অতি দুশ্চরিত্র সংসারাসক্ত ব্যক্তিদিগের মনেও ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। অনেকে উপহাস করিতে আসিয়া শেষে কাঁদিয়া গিয়াছে। লোকসমারোহ, নৃত্যকীর্ত্তন,

ক্রন্দনের রোল, সাধনভজনানুরাগ, মত্ততা, ভক্তসেবা এত অধিক হইয়াছিল যে দুর্ব্বলমনা বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মেরা ভয় করিত, পাছে মুঙ্গের গেলে পাগল হইয়া যাই। অনেকে কেল্লার পথ দিয়া হাঁটিত না, বলিত যে কেশব সেন যাদু করিয়া ফেলিবে।"

ভক্তির উচ্ছ্বাস যখন এই ভাবে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন সমন্বয়াচার্য্য শ্রীকেশব গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধে মুঙ্গের কিছুকালের জন্য হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া সিমলাভিমুখে গমন করিলেন। সমন্বয় ও সামঞ্জস্য তাহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি একদিকে আদর্শ ভক্ত, অন্যদিকে আদর্শ কর্ম্মযোগী। সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের সূত্রপাত তাঁহার কার্য্যতালিকার ধারা ছিল। তাই নব বিবাহ-বিধি প্রণয়নের ব্যাপার নিয়া রাজপ্রতিনিধি যখন তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি সিমলায় চলিয়া গেলেও যত দিন সেখানে ছিলেন ততদিন মুঙ্গেরের ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ আত্মিক যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি সিমলা হইতে সাধু অঘোরনাথকে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভ দিন, এই হিমাচলে বসিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ

প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি কথা পাঠাইলে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে না; কোথায় রাখিব? অবাক হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে বলিতে পারি না। ব্রহ্ম-নামে মাতিল আমার প্রিয়তম মুঙ্গের! ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয় একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক; মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে।......অঘোর! আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক, সকল কামনা পূর্ণ হইবে। যিনি আবেদন-পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয় পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত আর কিছুই পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দেও। অঙ্গীকার করিতেছি তাহা প্রাপ্ত হইবে।...

"মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের! তোমার মঙ্গল হউক।"

খ। আলোকে আঁধার।

এ সংসারে কোন মহৎ কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। সম্পদের অগ্রদূত বিপদ। দুঃখ ভিন্ন সুখের মিষ্ট আস্বাদ কোথায়? আঁধারের গুণেই আলোক বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তিতে

শোভা পায়। এই তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত কেশবজীবন তাহার সাক্ষী।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মুঙ্গেরের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, বৃদ্ধ যুবা অনেকেই শ্রীকেশবের প্রেমজালে পড়িয়া বন্দী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এমন সব লোক ছিলেন যাঁহারা পাপকে পরম বন্ধু বলিয়া আদরের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিতেন। বহু তপস্যায় যে সকল কদভ্যাস ও অনাচার দূরে পরিহার করা যায় না, তাহা সমস্তই শুধু ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মানন্দের দেবচরিত্রপ্রভাবে অদৃশ্য হইল। ভক্তপ্রবরের মুখে সুধাময় ব্রহ্মতত্ত্বকথা শুনিয়া এবং তাহার পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া কত পাপীতাপীর প্রাণ স্বর্গে পরিণত হইল, কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল, কত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস তিরোহিত হইল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ লোকের মনে ধারণা হইল যে শ্রীকেশব বশীকরণ মন্ত্র জানেন, যে কেহ তাঁহার নিকটে একবার যায় সে আর সংসারে ফিরিয়া আসে না। এই বিশ্বাসে অনেকে নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের নিষেধের এই যুক্তি ছিল যে তাঁহার নিকট গেলে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু এই প্রকার নিষেধ-বাণী বিশেষ কোন কাজে আসিল না। মুঙ্গেরের বহু ধর্ম্মকাম ব্যক্তি এই নবীন ভক্তের প্রেম-কুহকে পড়িয়া মহাভক্তিভাবে উন্মত্ত

হইয়া উঠিল। সে যে কি কাণ্ড তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। ক্রমে ভক্তির আতিশয্য স্বভাবের সীমা ছাড়াইয়া চলিল। পরস্পরের চরণে অবলুণ্ঠন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ, ভক্তগণের ভোজনাবশিষ্ট স্বর্গের সুধা মনে করিয়া ভক্ষণ ;—এই সকল নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিল। এই ভাবে ভক্তি-প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য-স্থল হইলেন শ্রীকেশবচন্দ্র। ইহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইল ; শ্রীকেশব সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিষম পরীক্ষায় পড়িলেন। ঋষি গৌরগোবিন্দ তাঁহার "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক পুস্তকে এই ব্যাপারের একটী অতি হৃদয়-গ্রাহী বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই বিবৃতির কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"যে দিন সংবাদ আসিল, আগামী কল্য প্রাতে কেশবচন্দ্র সিমলা হইতে মুঙ্গেরে আসিয়া ভক্তদলের সহিত মিলিত হইবেন, সে দিন এ সংবাদ ভক্তগণ মধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইল। কথা উঠিল অদ্য প্রভাত হইবা মাত্র স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিবে, যিনি যাহা চাহিবেন তাহা পাইবেন, পরিত্রাণ লাভ নিশ্চয়। এ কথার উপরে "যদি" শব্দ উচ্চারণ করে কাহার সামর্থ্য ? ভক্তগণ প্রমত্ততার চরম সীমায় আরোহণ করিলেন। আজ সমগ্র নিশা জাগরণ, সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনার মহাধূম। প্রভাত হইতে না হইতে শঙ্খ কাঁশর ঘণ্টার ধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ। সমুদয় মুঙ্গেরকে

জাগাইয়া তুলিবার জন্য সকলে মহাব্যস্ত। সকলেরই মন আশায় উৎফুল্ল। প্রাভাতিক বায়ু বহিল, আঁধারে আলোকের রেখা প্রবেশ করিয়া উহাকে বিরল করিল, ক্রমে পূর্ব্বদিক্ প্রকাশ হইয়া উঠিল। প্রমত্ত ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন।······এদিকে কেশবচন্দ্র সপরিবারে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের (সে সময়ে ইনি রেলওয়েকার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেন) গৃহে অবতরণ করিয়াছেন, দূর হইতে তাঁহার কর্ণে সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ যতই প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ততই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নানের উদ্যোগ হইয়াছিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঐ যে প্রসন্ন, ইহাঁরা আসিলেন।' কোন প্রকারে স্নান করিয়া লইলেন। দৌড়াদৌড়ি পথে আসিয়া বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাঁহাকে আবেষ্টন করিলেন, প্রকাণ্ড হুড়াহুড়ি উপস্থিত, কে আগে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারে এই জন্য ইহাঁরা ব্যস্ত। কেশবচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুই হাত বক্ষে রাখিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান, কে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতেছে, পদধূলি গ্রহণ করিতেছে, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেছেন না। একজন রোমাণ ক্যাথলিক্ সাহেব ইহা দেখিলেন, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা ধর্ম্ম-যাজকের পদধারণ

তাঁহাদের মধ্যে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার নয়। কেশবচন্দ্রকে বেড়িয়া কীর্ত্তনের রোল উঠিল। মৃদুমন্দপদে ভক্তগণ বাজারস্থ উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। যেখানে যেখানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন হইতে লাগিল সেখানে কেশবচন্দ্রের পায়ে পড়িবার জন্য হুড়াহুড়ী। নব সূর্য্য উদিত হইয়াছে, কেশবের গৌর মুখে আলোকচ্ছটা নিপতিত, উহা অতীব আরক্তিম বেশ ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত, কাতরোচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ গলদেশ স্ফীত, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, হস্তদ্বয় কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ উপরি স্থাপিত, প্রস্তরবৎ অচল অটল হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। এইরূপে আস্তে আস্তে কীর্ত্তনীয়া দল উপাসনা-গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কীর্ত্তন থামিল, উপাসনা আরম্ভ হইল। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল।"

গ ঘ। আঁধারে আলো।

শ্রীকেশব তাহার নিজের সম্পর্কে শিষ্যগণের এই ভক্তির আতিশয্য দর্শন করিয়া কত দূর পর্য্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা উপাসনার ভিতর দিয়া সকলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। আরাধনা ও সাধারণ প্রার্থনার পরে যখন তিনি কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজ তোমরা এ কি করিলে, পিতার প্রাপ্য সামগ্রী কেন আমায় দিয়া অপরাধী করিলে? আমি তোমাদের সেবা করিতে

আসিয়াছি, আমাকে সেবক ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিও না”—আর যখন তিনি উপাসনান্তে ভূমিতে লুটাইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন, তখন যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, “আজ ইঁহার গুণে আমরা পরিত্রাণ লাভ করিব”, তাঁহাদের চিত্তে গূঢ় ভাবে সংশয় প্রবেশ করিল। তাঁহারাই ক্রমে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মহা আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের গুরু-দক্ষিণা

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীকেশব তাঁহার কয়েকটী অনুগামী সহ ষ্টেসন্‌প্লাট্‌ফরমে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। “আপনি নিজকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছেন, আমি আপনার এই অহঙ্কার চূর্ণ করিব”, ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি তাঁহার দীক্ষা-গুরুর হৃদয় রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। ক্ষমার অবতার শ্রীকেশব শান্ত সমাহিত চিত্তে মিষ্ট ভাষায় বলিলেন, “বিজয়, অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?” তাঁহার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, তিনি ক্রোধভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকেশব এইরূপ লাঞ্ছিত হইয়াও নির্ব্বিকার চিত্তে যখন সায়ংকালের উপাসনায় নিরত হইলেন তখন সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যেন স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইতেছে। ভক্তগণের সমস্ত দুঃখ তাপ দূর হইল, তাঁহারা বিমল শান্তি সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইলেন।

কিন্তু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ তখন কোথায়? তিনি অবিশ্বাসের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মানন্দদেবকে শুধু ভর্ৎসনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য অস্থির হইলেন! অগৌণে তিনি তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, এবং মিলিতভাবে প্রথমে "ইণ্ডিয়ান্ ডেইলি নিউজে," তৎপর "সোমপ্রকাশে" "নরপূজা" শীর্ষক পত্র বাহির করিলেন। ইহার ফলে অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিল। শ্রীকেশবের শত্রুগণ সুযোগ বুঝিয়া দেশে বিদেশে নানাভাবে তাঁহার নিন্দা ও গ্লানি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারতবাসীর যেন মহা বিপত্তি উপস্থিত! কিন্তু শ্রীকেশবের প্রাণ অচল অটল, স্থির প্রশান্ত! তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে অতি মিষ্টভাবে তাঁহার বিপথগামী শিষ্য দুটীকে যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"সত্যের জয় হইবেই হইবে, সেই জন্য ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকট কেবল এই বিনীত প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন

কিছুতে অমঙ্গল না হয় এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি, এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর; কিন্তু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে, তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তিলাভ করুক।"

(১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯০ শক)

ধন্য কেশবচন্দ্র! সত্যেতে তাঁহার কি গভীর নিষ্ঠা! ভগবানের মঙ্গলবিধানে কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! অনুগতজনের সদ্গতির জন্য প্রাণের কি গভীর আকাঙ্ক্ষা!

ন্যায়ের খাতিরে এই কথা উল্লেখ-যোগ্য যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাধারণতঃ চলচিত্ত হইলেও তাঁহার হৃদয়-মূল বিশুদ্ধ ভক্তিরসে সরস ছিল। তিনি প্রকৃতই একজন হরিভক্ত ছিলেন। নরপূজার আন্দোলন যখন স্বভাবের নিয়মে থামিয়া গেল, এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় জগতের নিকটে প্রতিভাত হইলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় আপনাকে "জুডাস্ ইস্কেরিয়েট তুল্য" মনে করিয়া বড়ই অনুতপ্ত মনে শ্রীকেশবের কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শ্রীকেশব এই সম্পর্কে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারকে লিখিয়াছিলেন,—

"বিজয়কৃষ্ণ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন আমার প্রতি কোন দোষারোপ করেন নাই, আমার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা আছে। তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অস্থির চিত্ত হইয়াছেন প্রকাশ পাইতেছে। "নরাধম জুডাস্ ইস্কিরিয়ট তুল্য" এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে আসিলেই আমি কৃতার্থ হই।"

লীলারসময় শ্রীহরি সুকোমল কেশব-হৃদয় অধিকার করিয়া পুণ্য-তীর্থ মুঙ্গেরে কি অপরূপ লীলাই প্রকটন করিয়াছিলেন!

একবিংশ অধ্যায়।

নববিধানে ভক্তির বিশ্বরূপ।*

এই গ্রন্থের ঊনবিংশ অধ্যায়ের আরম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকেশবের ভক্তি ধর্ম্মরাজ্যে এক অভিনব বস্তু। "ভক্তি" বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায় ইহা তাহা নহে। বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য এই তিন স্বর্গীয় উপাদানে ইহা গঠিত; উদারতা ইহার স্বভাব, এবং সামঞ্জস্য ইহার প্রাণ। যেখানেই মিলনের ভাব সেখানেই ইহার বিকাশ ও উচ্ছ্বাস।

এই হইল যখন শ্রীকেশবের প্রকৃতিগত ভক্তি তখন

* অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইহা যে নববিধানের পূর্ণ প্রকাশে বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

নববিধান ঘোষণার পরে একটী ধর্ম্মপিপাসু লোক শ্রীকেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"নববিধানের মহাপ্রকাশ আপনি সর্ব্বপ্রথমে কেমন করিয়া জীবনে উপলব্ধি করিলেন ?"

শ্রীকেশব রূপকচ্ছলে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—

"তা কি আর বলা যায় ? আমার ধর্ম্মজীবনের উষা-কালে এক অদ্ভুত আকাশ-বাণী শুনিয়া ব্যাকুল চিত্তে ঘরের বাহির হইলাম। এমন মধুর স্বরে কে আমাকে ডাকিলেন ? সেই অচিন অজানা জনটী আমার কে হন ? অন্তরের অন্তরতম দেশে সাড়া পাইলাম যে তিনিই আমার জীবন-দেবতা। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই বাণী অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে একটী নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বিনী আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেই সটান স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, এবং ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিলাম ! দিবার পর রজনী, রজনীর পর দিবা কত আসিল আবার চলিয়া গেল। আমি আঁধারে আলোকে জীবন-দেবতার অব্যক্ত মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে অবিশ্রান্ত

চলিতেই লাগিলাম। সহসা সম্মুখে কি দেখিলাম! অকূল অনন্ত মহাসমুদ্র! তাহাতে বিচিত্র বর্ণের অগণ্য নদ নদী পৃথিবীর নানা দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রত্যেকটীর জলই বিমল, মধুর ও জীবনপ্রদ। আবার ঐ কি শুনিতেছি? কোটীকণ্ঠে মহামিলনসঙ্গীত! নিমেষের ভিতরে অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেল! এ যে মহাসাগরসঙ্গমে মহাধর্ম্মমেলা। সমস্ত যুগধর্ম্মবিধানের বিস্ময়কর মিলন! ঊর্দ্ধে একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বিরাজিত, আর তাঁর সিংহাসন-তলে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সমস্ত সাধুভক্ত-মহাজনগণের আশ্চর্য্য সমাবেশ! এইতো আমার জীবন-দেবতা! এইতো আমার ধর্ম্মমণ্ডলী!— এইতো নববিধান!"

শ্রীকেশব তাঁহার জীবনে নববিধানের প্রকাশ সম্পর্কে রূপকাত্মক ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মূলে যে নিরেট সত্য নিহিত আছে তাহা আমি এই গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে পরিষ্কার ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে যখন তিনি সত্যধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন তখন লীলারসময় ভগবান্ তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "প্রার্থনা কর! প্রার্থনা কর!" কি ভাবে প্রার্থনা করিতে হয় তাহা শ্রীকেশব জানিতেন না; পবিত্রাত্মা ঈশ্বরই দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রার্থনা-স্রোত খুলিয়া দিলেন। তিনি এই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যথা সময়ে ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে নববিধানের মহামিলনতীর্থে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। সেখানে সমস্তই একেতে মিলিয়া মিশিয়া একাকার। এক ঈশ্বর! এক মানুষ! এক ধর্ম্ম!

ক। নববিধান ঘোষণা।

"নববিধান" বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা কেশব-জীবনে একদিনে হঠাৎ প্রকাশিত হয় নাই। ইহা তাঁহার সমস্তজীবনব্যাপী সাধনার ফল। যে মুহূর্ত্তে পরমেশ্বর যুবক কেশবকে প্রার্থনার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার জীবনের মূলে প্রত্যক্ষভাবে ইহার সঞ্চার হইল। এখানেই শ্রীকেশবের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষ রামমোহন ভগবৎপ্রেরণায় ধর্ম্মের যে উদার আদর্শ জ্ঞান-নেত্রে অবলোকন করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহারই ভিতরে নববিধানের ভাব সম্ভাবনারূপে স্থিতি করিতেছিল। ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে কেশবজীবন আশ্রয় করিয়া সেই ভাবকে মূর্ত্তি দান করিলেন। তার পরে এই নবযুগধর্ম্মবিধান স্বভাবের নিয়মে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ২৫ বৎসর অন্তে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করিল তখন (অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) ব্রহ্মানন্দদেব বিজয়পতাকা উড়াইয়া ও তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া

ইহার মহাপ্রকাশবার্ত্তা সংসারে বিশেষ ভাবে ঘোষণা করিলেন*। সে যে কি স্বর্গীয় মহাব্যাপার তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছেন। এই সম্পর্কে "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মমন্দিরের বেদী-সন্নিহিত স্থান বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত হইয়া শান্তরসপ্রধান তপোবনের অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। তপনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গৃহ সঙ্গীত-লহরীতে পূর্ণ হইল। আচার্য্য স্বীয় প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বেদীর শোভা বৃদ্ধি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎকৃত উদ্বোধনে সকলের মন উদ্বুদ্ধ হইল। আরাধনা ধ্যান ধারণাতে সকলের মন স্বর্গীয় দেবগণের সহবাস লাভের উপযুক্ত হইল। মানবগণ মধ্যে দেবগণ অবতীর্ণ হইলেন। যিনি যে আশীর্ব্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা নবজাত ব্রাহ্মসমাজ-তনয়ের মস্তকে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আচার্য্যের মুখ হইতে নব শিশুর জন্মসংবাদ ঘোষিত হইল। দেবগণ অদৃশ্য দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকল দিক্ প্রসন্ন হইল, নির্ম্মল সুশীতল সুগন্ধ অনুকুল বায়ু বহিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উৎসাহের লহরী উঠিল। এবার ক্রন্দনের ধ্বনি নাই, সকলের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

---

*নববিধানের আরম্ভিক ঘোষণা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে জানুয়ারী তারিখে হয়। "Behold The Light of Heaven in India" বিষয়ক উপদেশ দ্রষ্টব্য।

এমন জন্মদিনে কে চক্ষুর জল ফেলে? দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মোৎসব করিতে পারে, এমন সৌভাগ্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? অদ্য দেবগণের সম্মিলন কেন? অনেক দিন যাহা হয় নাই আজ ধরাধামে তাহা কেন হইল? আজ যাঁহার জন্ম তিনি যে ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিবাদের মীমাংসা করিলেন, পরস্পরের নিকট ঘৃণিত সম্প্রদায় সকলের মহাপুরুষগণ পরস্পর স্কন্ধ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান, ইহা দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধে পৃথিবী সম্বন্ধে উহা অতি শুভ সংবাদ।"

বাস্তবিকই নববিধানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজগতে সত্য-যুগের অদ্ভুত লীলাভিনয় আরম্ভ হইল। স্থানকালের ব্যবধান আর রহিল না। ভূত ও ভবিষ্যৎ চিরজীবন্ত বর্ত্তমানে মিশিয়া গেল; দ্যুলোক ও ভূলোক একে একাকার হইল। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। চারিদিকে ধ্বনি উঠিল, "প্রেমরাজ্য সমাগত! প্রেমরাজ্য সমাগত!"

সত্যযুগের পুনরাগমন! মৃতের পুনরুত্থান! পুরাতনের চিরনবীন মূর্ত্তি ধারণ!

সমস্ত ধর্ম্মই যুগধর্ম্মবিধানরূপে সত্য ও নিত্য, এবং ঈশ্বরের অখণ্ড অনন্ত প্রকাশে এক। উর্দ্ধে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পিতামাতারূপে বিরাজিত, এবং নিম্নে তাঁহার সিংহাসন-তলে সমস্ত নরনারী পুত্রকন্যারূপে একত্র মিলিত; সর্ব্বদেশের

ও সর্ব্বযুগের সাধু ভক্ত যোগী ঋষি মহাজনগণ এই মহা-প্রেমপরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

জীবনে ও চরিত্রে এই মহাপ্রকাশের সম্যক উপলব্ধিই "নববিধান"। এই উপলব্ধির চির-বিকাশই আত্মার অনন্ত উন্নতি।

ইহা একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে নববিধানের অভ্যুদয়ের ফলে শ্রীকেশবের হৃদিস্থিত ভক্তি বিরাট্ রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। মৎপ্রণীত "শ্রীকেশব-সমাগমের" অষ্টম অধ্যায়ের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রীকেশব বিশ্বাসাত্মা পুরুষ। তাঁহার ভক্তির মূলে নববিশ্বাস জীবন্তভাবে বর্ত্তমান। যে সত্য-শিব-সুন্দর দেবতা তাঁহার ভক্তির পাত্র, তিনি এক স্থানে বদ্ধ নহেন, কিন্তু বিশ্বময় বিস্তৃত; তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে, অখণ্ড মানব-পরিবারে, আকাশে, ভূতলে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সর্ব্বত্রই জাগ্রৎভাবে বর্ত্তমান আছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি করিতে গিয়া নিখিল বিশ্বকে ভক্তির চোখে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? ভক্তি-শাস্ত্রের নিয়মই এই যে ভক্তির পাত্র যেখানে থাকেন এবং যত কিছুর সংশ্রবে আসেন, সমস্তই শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়া ভক্তের প্রাণ মন ধরিয়া আকর্ষণ করে। এই জন্যই কেশবচন্দ্রের ভক্তি ঈশ্বরের চরণ-ধূলির স্পর্শগুণে

বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিখিল মানব-মণ্ডলীতে ছড়াইয়া পড়িল।"

ভক্তির এই "বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ" কি যে অলৌকিক ব্যাপার তাহা বিচিত্র ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া নিত্য নূতন ভাবে নূতন আকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

১২ই মাঘ জগতের পক্ষে একটি মহাদিন, কেননা এই পবিত্র দিবসেই কলিকাতাবাসিগণ নববিধান-ঘোষণার মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন। পর দিবস, অর্থাৎ ১৩ই মাঘ অপরাহ্নে তাঁহারা আর একটী স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া মহা ভক্তিভাবে ডুবিয়া গেলেন। শ্রীকেশব নবভক্তদলে পরিবেষ্টিত হইয়া,—

"এস এস, এস মা আনন্দময়ী, ব'স হৃদয়-কমলে।

(স্বর্গরাজ্য সঙ্গে ক'রে গো) (ভক্তবৃন্দে সঙ্গে লয়ে গো),"

এই গানটী ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গাইতে গাইতে যখন কমলকুটীর হইতে বাহির হইয়া বিডনস্কোয়ারের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন তখন প্রকৃতই ধরাতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল। এই সম্পর্কে "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিয়াছেন—

"সঙ্কীর্ত্তনের সহায় ব্রাহ্মগণ গৈরিক বস্ত্রে ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া "নববিধান" এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অঙ্কিত বৃহৎ পতাকাদ্বয় শকটযোগে এবং ঊনপঞ্চাশৎ পতাকা বালক ও যুবকগণের হস্তে, চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ ও করতালাদি লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডনস্কোয়ারাভিমুখে প্রস্থান করেন।

ঠিক অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের যুদ্ধ-সজ্জা। সে দিবস লোকের ব্যগ্রতা, উৎসাহ, ব্যাকুলতা কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে না। প্রায় ছয় সহস্র লোকের সমাগম। সকলেই সম্মুখ স্থল অধিকার করিতে ব্যগ্র; কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে? সঙ্গীতান্তে আচার্য্য মহাশয় নয়নোত্তোলন করিয়া প্রার্থনান্তর উপদেশ প্রদান করেন। লোকের উৎসাহধ্বনি ও আনন্দপ্রকাশে স্থান পরিপূর্ণ। এই ঘোর শুষ্কভাবের প্রাবল্যের সময়ে মনুষ্যমন ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তির জন্য যে কত দূর লালায়িত তাহা অদ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে দৃশ্য দেখা হইয়াছে ইহা আর কখন বিস্মৃত হইবার নহে।"

১৫ই মাঘ, বুধবার, অপরাহ্ণে শ্রীকেশব প্রায় একশত উন্মত্ত ভক্ত সহ বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করিয়া উত্তরপাড়া যাত্রা করেন। জাহাজ খানা নানা বর্ণের পতাকা ও পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কারিয়াছিল। যখন তাঁহারা মৃদঙ্গ, করতাল, তুরী, ভেরী প্রভৃতির একৈতান বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ কাঁপাইয়া গভীর নিনাদে নববিধানের জয় ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন নদীর কূলে কূলে বহু লোকের ভিড় হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা উত্তরপাড়ায় পৌঁছিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনে সমস্ত সহরটীকে এমনই মাতাইয়া তুলিলেন যে চারিদিক্ হইতে দলে দলে নরনারী আত্মহারা ভাবে ছুটিয়া আসিতে লাগিল; সকলের

মুখেই "কেশব সেনের" কথা। দেখিতে দেখিতে বিপুল জনতার সমাগম হইল; শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া পথের দীন দুঃখী কাঙ্গাল সকলেই সেখানে উপস্থিত। ঘন ঘন হরিনামের হুঙ্কার, থাকিয়া থাকিয়া ভক্তির আবেগময় ক্রন্দন, জ্ঞানহারা হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি—এইরূপ কতই চিত্তোন্মাদক দৃশ্য দেখা গেল। রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই অপরূপ অভিনয় চলিয়াছিল।

৫ই ফাল্গুন শ্রীকেশব দলে বলে প্রচারার্থ বর্দ্ধমান যাত্রা করেন, এবং সন্ধ্যাকালে সেখানে উপস্থিত হন। ষ্টেসন হইতে মহোৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা নগরে প্রবেশ করেন। পর দিবস সেখানে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা "ধর্ম্মতত্ত্ব" এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় সকলে নগরকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিয়া খোল, করতাল, ভেরী ও ১৫।১৬টী পতাকা ও নূতন বিধানের প্রকাণ্ড নিশান সহ সিংহনাদে ব্রহ্মনামধ্বনি করিতে করিতে নাচিয়া নাচিয়া নগরের পথে বাহির হন। পথে লোকের এরূপ ভিড় হয় যে, ঠেলাঠেলিতে চলিয়া যাইতে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রায় তিন মাইল স্থল ব্যাপিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলে নগরকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। নগরবাসী অনেক ভদ্রলোক কোমর বান্ধিয়া উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে

যোগদান করিয়া ব্রহ্মভক্তদিগের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান মৌলবী আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের পতাকা ধারণ করেন ও উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সমুদয় পথ পর্য্যটন করেন। দুইজন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব নানা ভঙ্গীতে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়ান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাছারীর মাঠে আচার্য্য মহাশয় ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন।......দুই সহস্র কি দেড় সহস্র শ্রোতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে চমৎকৃত, আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া সকলে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন।"

হিন্দু বৈষ্ণবের সঙ্গে মুসলমান মৌলবী একপ্রাণ এক-হৃদয় হইয়া প্রমত্তভাবে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এইরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য কেহ আর কখনও দেখিয়াছেন কি? ভক্তির বিশ্বরূপ আর কাহাকে বলে ?

দিনের পর দিন এই ভাবে নানা স্থানে নববিধান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির মহালীলাভিনয় চলিতে লাগিল।

খ। বিডন্‌পার্কে নবভক্তের শেষ বাণী।

১৮৮৩ সনের ২৩শে জানুয়ারী মহানগরী কলিকাতায় রব উঠিল, "কেশবচন্দ্র আজ বিডন্‌পার্কে স্বর্গের নূতন বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন। কলিকাতাবাসীর প্রাণ এক নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। দলে দলে যুবক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র

পার্কের দিকে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিস্তীর্ণ স্থান বিশাল জনতায় ভরপূর হইল। শ্রীকেশব যখন আসিয়া স্থির শান্তভাবে উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইলেন তখন সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন সকলেই নীরব নিশ্চল!

কলিকাতাবাসিগণ সে দিবস কি যে বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। শ্রীকেশব কঠিন রোগে নিতান্ত কাতর, মঞ্চের উপর আপনাকে সামলাইয়া রাখিবারও যেন শক্তি নাই। কিন্তু মুহূর্ত্তের ভিতরে তাঁহার দেহ মন প্রাণ এক অপার্থিব তেজে পূর্ণ হইল এবং সমস্ত মুখমণ্ডল সন্ধ্যা-সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখন তিনি লীলারসময় শ্রীহরির নিকট উচ্ছ্বসিত প্রাণে প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন স্তম্ভিত জনমণ্ডলী* মনে করিতে

* অনেকে আসিয়াছিল শত্রুতাচরণ করিয়া শ্রীকেশবকে জব্দ করার জন্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"In the last Bengali address that he [Keshub] delivered in the Beadon Garden in Calcutta, I noticed a hostile element, consisting of a number of Vaishnavas who were scoffing at him loudly before he began to speak, and yet those very men were so carried away by the Orator's appeal that they shouted 'Hari Bol' and rolled on the grass in an ecstasy of emotion and admiration."—Modern Review.

লাগিল যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের মত তাঁহার ভিতর হইতে অগ্নিময় বাক্য সকল বাহির হইতেছে! ক্রমে তাঁহার হৃদয়ের উত্তেজনা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল তখন সঙ্কেতধ্বনির সাহায্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা হইল! তাঁহার ভগ্ন শরীরের সাধ্য কি যে স্বর্গীয় মহাভাবতরঙ্গের এই অপ্রতিহত বেগ সহ্য করিবে?

শ্রীকেশবের এই অদ্ভুত বাণী নিম্নে আংশিকভাবে প্রকাশ করা গেল—

"আমি কে যে আজ এখানে বৎসরান্তে উপস্থিত হইলাম? আমি জ্বলন্ত আগুন। কত জ্বলন্ত প্রত্যাদেশ পাইলাম! যেমন অগ্নি ছোটে তেমনি আমার মুখ হইতে জ্বলন্ত সত্যের কথা বাহির হইবে। আমি একজন লোক, তোমাদের দেশে বাস করি; এই লোক মৃত শাস্ত্র, মৃত দেবতা, মৃত মন্ত্র-তন্ত্রকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। কল্পিত শাস্ত্র ও কল্পিত ঈশ্বরকে আমি মানি না। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, আমার ঈশ্বর অগ্নির ন্যায়। বিশ্বাসের তেজে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অগ্নি উঠে; অগ্নি আমার জীবনকে সঞ্জীবিত রাখে। অগ্নিসমান আমার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্যই কোটী লোক একত্র হইলেও আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। যদি ভাল চাও অগ্নিপ্রচারকের কথা শ্রবণ কর!

আর কোন মৃত দেবদেবীর কথা বলিও না। হয় দেখাও তোমাদের দেবতা, না হয়, দেখ আমরা আমাদের

জীবিত দেবতাকে দেখাইয়া দিব। প্রত্যেকের নিকটে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিব।

যত ভক্ত ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলে কথা কহিতেছেন। কোথায়? এইখানে। ভূত নয়; প্রেততত্ত্বের কথা বলিতেছি না। তাঁরা কি গত? বল তাঁহারা কি পরলোকগত? বেদ কি বই? না, আগুন। বেদ আগুনের মত জ্বলিতেছে। পুরাণ কি ঘুমায়? আর ভারতকে ঠকাইও না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কে? কাশী বৃন্দাবন কি? যদি আগুন থাকে দেখাক্। এক আগুনে দশ গ্রাম পুড়িয়া যায়, কোটী অগ্নি একত্রিত হউক। এস ভক্তগণ এস, এস চার বেদ এস; গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি একত্র হও। হইবে না? সমুদয় একস্থলে আসিবে না? এখনই আসিতে হইবে।......

"উদার আর্য্যসন্তান আমরা; আমরা জন্মেও কাহাকেও শত্রু বলিব না। দেশীয় কি বিদেশীয় সকল সাধুকেই হৃদয়ে স্থান দিব।......এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চলে এস। উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর চলিয়া এস। নববিধানের বিধাতার আদেশ। কি মন্ত্র ভাই জান? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। মনের দ্বার খোল, মোহ পরিত্যাগ কর। যত ধর্ম্ম আছে, আমরা সকলকে বুকে রাখিব। ভেদ জ্ঞান নাই।"—

আচার্য্যের উপদেশ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণ!

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মিলন ভক্তি-রাজ্যে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই শুভ সংযোগ সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রকেই অবসরপ্রাপ্ত সেসন্‌জজ্‌ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কৃত "Keshub Chandra And Ram-Krishna" গ্রন্থ নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ক। প্রথম পরিচয়।

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীকেশবচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে দাঁড়াইয়া "Behold The Light Of Heaven In India" বিষয় অবলম্বনে নববিধানের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করেন, এবং ২৫শে জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অতি পরিষ্কার ভাষায় ঈশ্বরের জগজ্জননীরূপে সংসারে অবতরণ ঘোষণা করেন।* এই ব্যাপারের প্রায় ৩ মাস পরে যখন ব্রহ্মানন্দদেব বেলঘরিয়া তপোবনে সশিষ্য তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন তখন

---

* পর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ভগবানের লীলা-কৌশলে এক দিন হঠাৎ আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ইহাই প্রথম পরিচয়। এই সময়ে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পরম শ্রদ্ধাভাজন মৌলানা গিরীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি এই ঘটনার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের দৃষ্টিতে মূল্যবান বলিয়া আংশিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

মৌলানা গিরীশ-চন্দ্রের সাক্ষ্য

"পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশব-চন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণসহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পরদিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত।...তাঁহার পরিধেয় রাঙ্গা পেড়ে বস্ত্র মাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতা-বস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্বদিকের বৃহৎ ঘাটে কেশব-চন্দ্র বন্ধুগণসহ উপস্থিত ছিলেন। স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকট উপনীত হইলেন।......সমাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার আসন প্রদত্ত হইল। সমাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত?)

প্রথমেই বলিলেন, 'বাবু! তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।' প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটী রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাইতে গাইতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন, এবং ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারেও প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে আধ্যাত্মতত্ত্ব বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক হইয়া গেলেন।...

"পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুই দিন পরে বা দুই দিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রের যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধন্য তাঁহার শিষ্য প্রকৃতি! একটী সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে; এ সময়ে এই সমুদয় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে [পরমহংসকে] তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর

কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার পন্থা থাকিল না।”—(১৩৩৪ সালের ১লা ও ১৬ই ভাদ্র এবং ১লা আশ্বিন তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত)

খ। আত্মিক সম্পর্ক।

বরিশালের খ্যাতনামা দেশসেবক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যখন আমি মহানগরী কলিকাতায় বাস করিতাম তখন তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসিয়া দুই এক দিন অবস্থান করিতেন, এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, এবং এমন আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত এই ভক্তপ্রবরের জীবন সম্পর্কে গল্প করিতেন যে আমাদের চিত্ত তাহাতে একেবারে গলিয়া যাইত।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ভক্তযুগল

অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখন কেমন করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের “যাদুর” ভিতর পড়িয়া যান। একবার তাহার অগ্নিময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি এত বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে ঐ অল্প বয়সেই ধর্ম্মপ্রচার করার জন্য নগ্নপদে কলিকাতা হইতে যশোহরে চলিয়া যান!

অশ্বিনীকুমারের মুখে আমি কেশব-জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর কথাই শুনিয়াছি। যে দুটী কাহিনী আমার প্রাণকে

খুব বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এক দিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। এই অদ্ভুত মানুষটীর কুটীরে গিয়া দেখিলেন যে তিনি একখানা কালপেড়ে ফিন্ ফিনে ধুতি পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যেন কি জন্য অস্থির। তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন, আবার বাহিরে গিয়া কি যেন দেখিয়া আসেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে সহসা শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কয়েকটী বন্ধুসহ হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেবের মুখ পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। স্নেহ-ময়ী মা তাঁহার অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বহুকাল পরে দেখিয়া যেমন সুখে বিহ্বল হইয়া পড়েন, শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল; তাঁহার প্রিয়তম কেশবচন্দ্র কাছে আসিবা-মাত্রই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রাণে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তোমার বিলম্ব দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম যে তুমি বুঝি আর আসিবে না, তাই আমার মনে বড়ই উদ্বেগ হইতেছিল।" ভক্তের প্রাণ ভক্তের জন্য কিরূপ আকুল হয়, এবং তাঁহাদের সম্মিলনে কি যে মহাপ্রেমের আবির্ভাব হয় তাহার জীবন্ত প্রমাণ লাভ করিয়া অশ্বিনীকুমার বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে

পরমহংসদেবের প্রাণ পূর্ব্বে কেন এত অস্থির হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব! কিছু হবে কি?" কেশবচন্দ্র উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ, হবে বৈ কি!"—হাস্য-রস-প্রিয় অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের এই সকল সঙ্কেত-বাক্য শুনিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"হুঁ! বুঝিয়াছি, তবে উঁহাদের সেই বস্তুটী সেবন করিবার সময় উপস্থিত।" যেই কথা, সেই কাজ। মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল! ঘন রোলে খোল কর্ত্তাল বাজিল! হরিনামের গম্ভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল, এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরস-মদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করতঃ প্রেম-কম্পিত পদক্ষেপনে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

২। একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র দলে বলে জাহাজে চড়িয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। এযে কি স্বর্গীয় ব্যাপার তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। পোতখানি নানা বর্ণের পত্রপুষ্প ও পতাকায় ভূষিত করা হইয়াছিল। প্রকৃতিদেবীও যেন তখন আপনার রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য খুলিয়া দিয়াছিলেন। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত গঙ্গা-বক্ষে স্নিগ্ধ আলোকের মুক্ত সঞ্চরণ। ভক্তগণের কথা আর কি বলিব? তাঁহাদের অঙ্গে গৈরিক,

কণ্ঠে ফুলহার, মনে উৎসাহের আগুন, হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ, মুখমণ্ডলে অনন্দের জ্যোতি। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশব-চন্দ্রকে তাঁহারা মাঝখানে রাখিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। মধুর হরিনাম গান, গঙ্গার কুলুকুলু তান, ঘন ঘন শঙ্খ ও তুরী ভেরীর ধ্বনি, বাষ্পীয় পোতের গভীর গর্জ্জন,—সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া এক মহা সঙ্গীতপ্রবাহে দূর দূরান্তরে ছুটিয়াছে।

এ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে আপনার কুটীরে বসিয়া কয়েকটী ধর্ম্ম-পিপাসু লোকের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করিতেছিলেন। সুধী অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্রসঙ্গ বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমুখে ভক্তিতত্ত্বকথা! কেনইবা না চিত্তাকর্ষক হইবে? সহসা পরমহংসদেবের কথা থামিয়া গেল, তিনি একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐযে হরিনাম করিতে করিতে কেশব আসিতেছেন!" কেহ কেহ তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ আরও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তোরা কি বুঝ্‌বিরে? কেশবের দল ছাড়া ঐভাবে কীর্ত্তন আর কি কেউ কর্‌তে পারে?"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ঘরের বাহির হইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সুসজ্জিত পোত কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলকে নিয়া ঘাটে লাগিল।

তখন হরিনামের মহারোলে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হইতেছিল। পরমহংসদেবকে আর ধরিয়া রাখে সাধ্য কার? তিনি জাহাজে উঠিবার জন্য পাগল হইয়া গেলেন। তাঁহার এক জন প্রিয় শিষ্য যখন "ও ঠাকুর! আপনি কোথা যান?" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে থামাইতে গেলেন, তখন তিনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এই অদ্ভুত বাণী উচ্চারণ করিলেন,—

"তোরা চলে যা! রাধা তাঁর শ্যামের কাছে যায়!"

বলা বাহুল্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ষ্টীমারে উঠিয়াই শ্রীকেশবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা", তখন ভক্তির বন্যা শতগুণ তেজের সহিত সকলের প্রাণের ভিতর দিয়া বহিতে লাগিল।

গ। শিশুভাব।

কেশব-জননী সারদাদেবী বলিয়াছেন,—

"ঐ তেতালার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধ'রে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। এক দিন কমল-কুটীরে মাঘোৎসবের সময়, বরণের দিন, সংকীর্ত্তনের পর আমি বলিলাম, 'আপনি কিছু খান।' তিনি খানিক ক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,

কেশবজননীর সাক্ষ্য

'হাঁ; মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী থেকে এক খানি জিলিপি খেয়ে আসিস্।' আমি এক খানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাত্ করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তার পর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, 'দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী যাইতেছ, একটী কুল্‌পী বরফ খেয়ে এসো।' তখন সেখানে কুল্‌পীওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্‌পী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্‌পীওয়ালা আসিল; একটী কুল্‌পী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্ত্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেক ক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন,—

'ছাখ্ মা, তোর যত নাড়ী ভুড়ী নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচ্‌বে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।'

"তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন সব আমার মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন, 'ছাখ্ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে, আর বলে, এই দিক্‌টা তোর আর এই দিক্‌টা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপ্‌ছে আর কেইবা নেয়, সেটা কিছু ঠিক

করে না।' আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন,—

'ছ্যাখ্ মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যে যায় ; আমি বুঝি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।'

"এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।"

আত্মকথা।

ঘ। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অলঙ্ঘ্য।

পৃথিবীর বাগানে কত রকমেরই সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে ; ইহাদের প্রত্যেকটীর ভিতরেই রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির বিশেষত্ব বর্ত্তমান, এই জন্যই প্রত্যেকটী জগতে অতুলনীয়। কুসুমতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিবেন না যে এই ফুলটী বড়, এই ফুলটী ছোট। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বড়ও নাই, ছোটও নাই ; এই দুইটী শব্দ ভাবুকের ভাববিকারের প্রতিধ্বনি মাত্র। ঈশ্বর যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুই তেমনি এক ও অদ্বিতীয়। কাহারও সঙ্গে কাহার তুলনা হয় না।

পৃথিবী সম্পর্কে যা, বৈকুণ্ঠ সম্পর্কেও তা। নন্দনবনে শুক, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বশিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ, জনক, বুদ্ধ,

ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, কেশব, রামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ প্রভৃতি কত ফুলই আপন আপন সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিধি-নির্দ্দিষ্ট ভাবে বিস্তার করিয়া ফুটিয়া আছে। বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে ইঁহারা প্রত্যেকেই রূপে ও গুণে অতুলনীয়। কিন্তু সংসারের লোক সেই ভাবে দেখে কৈ? ভবের বাজারে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "এই দেখ, আমার ধর্ম্মের ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বাহার কত! এমন সাচ্চা মাল আর কোথাও নাই।"—এই জন্যই পৃথিবীতে ধর্ম্ম নিয়া এত বাদ বিসম্বাদ। কত যুগ ধরিয়াই এই কলহ সমান ভাবে চলিয়া আসিয়াছে! সম্প্রতি নববিধান আসিয়া গভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, "সমস্ত ধর্ম্মই ঈশ্বরের বিধান, সমস্ত সাধু-ভক্তই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ।" কিন্তু পৃথিবীর কর্ণ বধির। এই যে ভগবানের বিশেষ নির্দ্দেশে চোখের সামনে শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন হইল, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া স্বর্গের অমূল্য ধনরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন, এবং একপ্রাণ হইয়া কত অভিনব খেলাই খেলিলেন, ইহা নিয়াও কত কথা কত বিচার তর্ক চলিতেছে! শ্রীরাম-কৃষ্ণের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশবিদেশে কত ভাবে কত চেষ্টাই করিতেছেন। কিন্তু বিধানের জয় হইবেই হইবে; শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন চিরতরে অক্ষুন্ন থাকিবেই থাকিবে।

স্বয়ং শ্রীহরি নন্দনবনে যে দুটী ফুল পাশাপাশি ফুটাইয়া রাখিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপরে ও নীচে বসাইয়া দেয়?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মা আনন্দময়ীর আগমন।

"The reign of the Supreme Mother shall be proclaimed and established throughout the world amid universal rejoicings, and many nations with myriad voices and diverse instruments shall sing that sweet name, Mother, which bringeth comfort to the sinner's heart and salvation to every trusting child."—

God-vision In The Nineteenth Century.

নববিধানে নারীর পদ আকাশের ন্যায় উচ্চ এবং গৌরবমণ্ডিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে শ্রীকেশব নারী-প্রকৃতির ভিতরেই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেন। ইহা এক দিনের ব্যাপার নহে, কিন্তু তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের আরম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকেশব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নববিধানের আরম্ভিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের আনন্দময়ী মা রূপে প্রকাশ বিশেষ ভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ভগবান্‌কে "মা" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, এই রূপ কথা বলা যায় না। তাঁহার প্রার্থনা ও উপদেশ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতেই মাঝে মাঝে "মা" নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তখন ঈশ্বরের পিতৃভাবই তাঁহার হৃদয়কে বিশেষ ভাবে বশতাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "ভারতাশ্রম" স্থাপনের পরে মাতৃভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। নারী-জাতির সেবার ফলে এই দিক্-পরিবর্ত্তন স্বভাবের নিয়মে কিরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই আমি অতি সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ক। নারীজাতির সেবা।

নারী-সেবা কেশবজীবনের একটী বিশেষ ব্রত। ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতেই তিনি এই পবিত্র ব্রত পালনে নিরত ছিলেন। আর্য্য-নারীর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি প্রাণে কি দারুণ ক্লেশ অনুভব করিতেন, এবং এই শোচনীয় অবস্থা যাহাতে দূর হয় সেই জন্য কিরূপ ব্যাকুল চিত্তে এক দিকে ভগবানের চরণ ধরিয়া কাঁদিতেন, এবং অন্য

দিকে ভিখারীর বেশে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বারে উপস্থিত হইয়া সংসারে নববিধানের আদর্শপরিবার স্থাপনের জন্য তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেন, তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। "ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ" নারী-জাগরণের পক্ষে এক অমূল্য গ্রন্থ; যাঁহারা একটু নিষ্ঠার সহিত ইহা পাঠ করিবেন তাঁহারাই কেশবচন্দ্রের নারী-সেবার অভিনবত্ব ও মাহাত্ম্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীকেশব নারীজাতির মুক্তির জন্য শুধু উপদেশ দান করিয়া কিম্বা ঈশ্বরের চরণে প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহাদের চরিত্র যাহাতে নববিধানের নবজীবনপ্রদ নির্ম্মল বাতাস ও আলো পাইয়া অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন ভাবে পূর্ণবিকসিত হয়, সেই জন্য নানা প্রকারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। যথা, "নারীবিদ্যালয়," মহিলাদের জন্য নর্ম্মাল্‌স্কুল, "বামাহিতৈষিণী সভা," "ব্রাহ্মিকাসমাজ," "আর্য্যনারীসমাজ," "ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন্" প্রভৃতি স্থাপন, এবং 'পরিচারিকা', "মহিলা" ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ।

শ্রীকেশব এই ভাবে নারীজাতির সেবা করিতে গিয়াই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের মাতৃরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। নারীপ্রকৃতির পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে নারী ভগবানের মাতৃপ্রকৃতির প্রকট মূর্ত্তি. তাই সংসারে তাঁহার স্থান স্বভাবতঃই অতি উচ্চ।

খ। ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচার।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী শ্রীকেশব একটী উপদেশে ব্রাহ্মিকাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ভগিনিগণ, বিশ্বাস কর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি, তোমাদের দুঃখে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিতেছি, আর নিরানন্দ থাকিও না। যাদের মা আনন্দময়ী তাহারা কেন নিরানন্দ ? তোমরা এমন স্নেহময়ী মাতার ঘরের কাছে থাকিয়া কেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাও ?"

ভগবান্ যে "আনন্দময়ী মা" রূপে সংসারে অবতীর্ণ এবং তিনি যে আমাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন তাহা শ্রীকেশব অল্প কথায় অতি পরিষ্কার ভাবে এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহাতে ঈশ্বরের মাতৃভাবের আশ্চর্য্য বিকাশ দেখা যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"মেয়েদিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে, কিম্বা কোন রাক্ষসী মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে।"

কন্যাগণের মুক্তির জন্য পরম মাতার প্রাণ যে সর্ব্বদাই অস্থির তাহা এখানে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ তিনি ভারতাশ্রমে বেদী হইতে এই ভাব ব্যক্ত করেন যে পুরুষজাতি বিশেষরূপে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং নারীজাতি বিশেষ রূপে তাঁহার মাতৃভাব চরিত্রগত করিবার জন্য যত্ন করিবে। পুরুষগণ কখনও নারীদের এবং নারিগণ কখনও পুরুষদের অনুকরণ করিবেন না। যথা—

"তোমাদের প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে পুরুষেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তোমরা তাহার অনুকরণ করিও না। ঈশ্বর পুরুষদিগকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন তাহা কেবল পুরুষদিগেরই জন্য, তোমাদের জন্য নহে।......আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকি, তোমরা তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাক।"

শ্রীকেশবের এই উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি স্বভাবের নিয়মে নারী প্রকৃতির ভিতরে সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন। এই উপদেশের পরে তিনি যে প্রার্থনা করেন তাহাতে এই সত্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ শুন তিনি তাহার জীবনদেবতাকে কি বলিতেছেন—

"করুণাময়, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিবে কে, যদি ভগ্নীরা তোমার কাছে না আসেন। ভগ্নীরা যদি তোমাকে তোমার কন্যার উপযুক্ত উপহার না দেন, তবে ত আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের আশা নাই।......তাই ঐ চরণে হস্ত রাখিয়া তোমাকে

ডাকিতেছি, যাহাতে সমুদয় ভগ্নীরা তোমার এই বিধানে যোগ দিয়া তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হস্তে তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন এই আশীর্ব্বাদ কর।”

শ্রীকেশব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে (পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে) ঈশ্বরের জগজ্জননীরূপে সংসারে অবতরণ অতি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি ব্রহ্মকন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

“তোমরা কাহার কন্যা? মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যার মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে; যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর।...... ভগ্নিগণ, বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিওনা, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর।”

গ। পরমেশ্বর নারীজাতীর শ্রেষ্ঠ।

১৭৯৯ শকের ১৩ই মাঘ শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রাহ্মিকা-সমাজে যে একটী উপদেশ প্রদান করেন তাহাতে তিনি ঈশ্বরের জননীমূর্ত্তি প্রকাশ সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া

নারীজাতির আসন আকাশ অপেক্ষাও ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন করিয়াছেন। যে পরম দেবতা মা রূপে সংসারে অবতীর্ণ তিনি নারীজাতির শ্রেষ্ঠ এবং নারীজগতের আদর্শ! ঐ শুন তিনি কি বলিতেছেন—

"আজ কন্যাদিগের সভা হইয়াছে দেখিয়া তিনি [পরমেশ্বর] আপনার জননীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কন্যাদিগের কোমল ভাবের মধ্যে তাঁহারই লাবণ্য। সুন্দর দেশে, সুন্দর বেশে জননী কন্যাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।······নারীজাতির শ্রেষ্ঠ কে? নারীজগতের আদর্শ কে? আমি বলি পরমেশ্বর।"

ঘ। ভক্তেরা চিরকালই নারী।

শ্রীকেশব নারীজাতির সেবায় নিরত থাকিয়া নারীপ্রকৃতির ভিতরে জগজ্জননীর জীবন্ত জ্বলন্ত প্রকাশ উপলব্ধি করিলেন, এবং নারীজাতির আদর্শ হইয়াও মা যে শুধু তাঁহাদের ভিতরেই বদ্ধ নহেন কিন্তু সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য করুণাময়ীরূপে সংসারে অবতীর্ণ তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণের সাধ মিটিল না। জননীর সহিত সত্যেতে, প্রেমেতে ও পুণ্যেতে যথার্থ একত্ব স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্ত সন্তানের পূর্ণ তৃপ্তি কোথায়? প্রায় চারি বৎসর কাল মাতৃপ্রকৃতি ও

মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে নারীপ্রকৃতি যখন মাতৃপ্রকৃতিরই আলোক-চিত্র তখন নিজের পুরুষপ্রকৃতি পরিহার পূর্ব্বক নারীপ্রকৃতি আত্মস্থ করিতে না পারিলে মার অন্তঃপুরে প্রবেশের সাধ্য নাই। এই জন্যই মায়ের প্রত্যেক ভক্ত ভাবে ও স্বভাবে এক একটী নারী। ঐ শুন শ্রীকেশব তাঁহার চিন্ময়ী মাকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন—

"তোমার ভক্তেরা চিরকালই নারী। তোমার কোমল ভাব কঠোর-প্রকৃতি পুরুষের প্রাপ্য নহে। পুরুষেরা দেশ দেশান্তরে যাইয়া হরিনাম করিতে পারে, কিন্তু তাহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না। নারী না হইলে সেখানে কেহই যাইতে পারে না। অতএব মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রকৃতিকে নারীর প্রকৃতির ন্যায় কোমল কর।"—প্রার্থনা (৯।১।৭৯)

তিনি আবার তাঁহার মায়ের চরণে নিবেদন করিতেছেন—

আনন্দময়ী মা নারীর নারী

"তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে খেলা করিব।"—প্রার্থনা (২৬।১।৭৯)

৬। মাতৃপ্রকৃতিতে প্রবেশ।

শ্রীকেশব নারীপ্রকৃতির ভিতরে আসিয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন। অনন্ত উন্নতির পথে চিরকাল চলা যাঁহার জীবন-মন্ত্র তিনি কেমন করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকিবেন ? মার সঙ্গে এক হওয়াই তাঁহার সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। মার সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার মত হওয়া, অর্থাৎ তাঁহার কোলের ছেলে হওয়া। কোলের শিশু যেমন সব দিক্ দিয়াই ঠিক মায়ের মত, এমন আর কে ? এই জন্যই তিনি নারীপ্রকৃতিকে পন্থারূপে ব্যবহার করিয়া সত্য-শিব-সুন্দর মাতৃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং যোগবলে জননীর সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—

"নারীভক্তি, নারীবিনয়, নারীক্ষমা, নারীচরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও হে ভাই, প্রকৃতি হও হে পুরুষ।...আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—শ্রীমতী, শ্রীমতী, কোথায় রহিলে ? এস। ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, আকাশরূপিনী, জ্ঞানাকাশরূপিনী, তুমি এস আমাদের নিকট। ...দেবীপূজা করিতে করিতে দেবী হইব।"—প্রার্থনা।

আবার বলিতেছেন—

"মাকে দেখিব, মার মত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব। মা যেমন তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব।"—প্রার্থনা (১৬।১০।৮২)

আমি পূর্ব্বেই এই ভাব প্রকাশ করিয়াছি যে মার মত ছেলে হইতে হইলে মার ভিতরে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে হয়। ইহাতেই আমিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ এবং শিশুত্বের প্রকাশ। শ্রীকেশব আপনার জীবনে এই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"শরৎকালের বাদ্য বাজিয়া উঠুক। হস্ত নয়ন সব কোমল হউক। দেবী কণ্ঠে, দেবী চক্ষে, দেবী মাথায়। দুর্গা দুর্গতিহারিণী, এই শরীরের ভিতর এস, আর আমি, পাপী অধম দগ্ধ আমি, চিরকালের মত ভস্ম হয়ে যাই।"—প্রার্থনা

এই বলিদান, পাপী অধম "আমির" এই মৃত্যু অমৃতের সোপান হইল, কেননা এখানেই শ্রীকেশবের শিশু-জীবন আরম্ভ, এবং জননীর সঙ্গে চিরমিলনের সূত্রপাত।

চ। ভক্ত-কোলে ভগবতী।

বাস্তবিকই স্থানকালের কোলে লালিতপালিত পঞ্চভূতময় কেশব মাতৃ-প্রকৃতির প্রদীপ্ত পুণ্যানলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু তাঁর সংসারের সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট রহিল ভৌতিকের অতীত সেই সার, নীরেট, প্রচ্ছন্ন, চিন্ময় বস্তু যাহা আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশ। এই ঘনীভূত চৈতন্যময় অদ্ভুত পদার্থ শুধু অবিকৃত রহিল না, কিন্তু লীলাময়ীর রহস্যময় লীলা-কৌশলে অচিন্তিত নবীন আকারে,

জ্যোতির্ম্ময় কমনীয় মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। সরসীর বক্ষে কমল, মার কোলে শিশু! শিশু-কোলে মা আনন্দময়ীর প্রকাশ! "জ্যোতির কোলে জ্যোতি! চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়! গোলাপের কোলে ছোট গোলাপ! সৌরভের কোলে সৌরভ"! এই ভুবনমোহন হৃদয়রঞ্জন দৃশ্য কে দেখিবি রে?

এই অপরূপ মাতৃরূপের প্রকাশ সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় দেশে যেখানে জড় নাই, জরা নাই, অবিদ্যার বন্ধন নাই, স্থানকালের ক্রিয়া নাই, আত্মপর ভাব নাই, ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। এ যে আনন্দময়ী জননীর অক্ষয় আনন্দধাম! এখানে সমস্তই চিরনবীন, চির-কোমল, চির-সরস, চির-বিমল, চির-সুন্দর!

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

যোগানন্দ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক দিন ব্রহ্মচরণকমল বক্ষে ধারণ করিয়া যোগমগ্ন প্রাণে বলিয়া উঠিলেন,—

"হরি-বিয়োগেই হরিদাসের মৃত্যু; হরিসহবাসই হরিদাসের স্বর্গ। হরিদাসের অন্য পাপপুণ্য নাই।"—প্রার্থনা (১২।২।৭৯)

এই যে তিনি হরি-সহবাসকে স্বর্গ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বর্গের তো ভিন্ন ভিন্ন সোপান

আছে। শ্রীকেশবের মন চায় উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া যোগানন্দ-সাগরে মগ্ন হইতে। চিরগতিশীল তাঁহার আত্মা; ব্রহ্মভোগের অনন্ত পথ ধরিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। তাই তিনি শুধু ব্রহ্ম-সহবাসে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ব্রহ্ম-বাসী হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই ব্রহ্ম-বাস কি ব্যাপার তাহা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যদি শান্তি চাও, তবে কেবল ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিও না, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ কর। ঈশ্বর-সহবাসী নয়; কিন্তু ঈশ্বর-বাসী হইতে হইবে।... ব্রহ্মভক্ত বাস্তবিক ব্রহ্ম-নিবাসী। সুন্দর সেই অবস্থা যখন ব্রহ্ম-সন্তান নির্ভয় মনে ব্রহ্মের মধ্যে বাস করেন। সুমিষ্ট ব্রহ্ম-স্বরূপের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর হয়, এবং ব্রহ্মের প্রেম-রস পান করিয়া দিন দিন সেই আত্মা পুষ্ট ও সবল হয়।"—উপদেশ।

এই ভাবের কত কথাই তিনি কত সময়ে বলিয়াছেন। কেনই বা না বলিবেন? দিবানিশি ব্রহ্মেতে স্থিতিই ব্রহ্মানন্দের জীবন। ইহাই তাঁহার মোক্ষ-ধাম, ইহাতেই তাঁহার একমাত্র সুখশান্তি, আরাম ও আনন্দ। তাঁহার ভাগবতী তনু ব্রহ্ম-প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংসারের নানাস্থানে নানা ভাবে নরনারীর সেবা করিত; কিন্তু যোগারূঢ় প্রাণটী নিত্যকাল ব্রহ্মবাসী হইয়া নির্ম্মল ভূমানন্দ সম্ভোগ করিত। সংসারের রোগ, শোক, লাঞ্ছনা, অপমান কিছুই এই গভীর যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্ম-বাসী শ্রীকেশব এই ভাবে ব্রহ্ম-সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া গেলেন। এই ব্রহ্মে বিলীনতা যে কি অবস্থা তাহা তিনি একটী প্রার্থনাতে অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে ইহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটী ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম-অভিষেকে সমুদয় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্ম-অঙ্গ।... আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না হরি আস্‌বেন আমাতে? আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবেন আমাতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিলে গেলাম।" —দৈনিক প্রার্থনা (১৮।৯।৮২)

ইহাকেই বলে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব সাধন। শ্রীকেশব এই মহাযোগের শেষ অবস্থায় আসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।"—

জীবনবেদ।

আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র গাঁথা! আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে; যিনি ব্রহ্মানন্দ তাঁহার তো ইহাই নিয়তি!

আখ্যান।

শ্রীকেশবের ব্রহ্ম-ভোগ কি ব্যাপার তাহার সামান্য একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিলাম। এখন এই সম্পর্কে তাঁহার জীবন হইতে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

১। "ফাত্না ডুবেছে!"

(ব্রহ্মে মগ্ন)

শ্রীকেশব ধর্ম্মজীবনের আরম্ভেই যে ব্রহ্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন তাহার সাক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বয়ং দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই—

এক দিন তিনি আদিসমাজের ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াছিলেন। ভিতরে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন যে গৃহ লোকে পূর্ণ। একজন বেদীর উপরে বসিয়া ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন, এবং অন্য সকলে তাহা শুনিতেছেন। তাঁহার মনে হইল যেন শ্রোতারা সকলেই এক একটী "ছিপ" হাতে করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু যে সুন্দর গৌরবর্ণ

যুবকটী বেদীর ঠিক সম্মুখে বসিয়াছিলেন শুধু তাঁহারই "ফাত্না" ডুবিয়াছে।

২। যৌবনে ব্রহ্ম-ভোগ।

শ্রীকেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবীর মাসিমাতা বলিয়াছেন,—

"আগড়পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম কামারহাটী। সেই কামারহাটীতে জজ বেল সাহেবের বাগান নামে একটী মনোহর উদ্যান ও পুষ্প-বাটিকা ছিল, এখনও সেই বাগান আছে। ইহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-মণ্ডিত কুটীর ছিল, কেশব সেই বাগানে সকলের সহিত বেড়াইতে যাইতেন। সেই নির্জ্জন স্থানে তিনি কখনও কখনও সমবয়স্কদের নিকট হইতে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, সঙ্গীরা চেষ্টা করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেন না। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত ও দেবভাবপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ তাঁহার হঠাৎ অদৃশ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না। ক্রমে জানা গেল যে তিনি তাহারই মধ্যে অবসর করিয়া কোন নিভৃত কুটীর মধ্যে উপাসনায় মগ্ন হইতেন।"— সতী জগন্মোহিনী দেবী।

বলা বাহুল্য যে শ্রীকেশব তখন মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন।

৩। ধ্যানস্থ !

"সাধন-কানন" শ্রীকেশবের সাধনভজনের বিশেষ স্থান। তিনি অনেক সময় সশিষ্য তথায় অবস্থান করিয়া গভীর সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। এক দিন সেই নির্জ্জন বনে তিনি সকলকে নিয়া ব্রহ্মপূজায় নিরত আছেন। আরাধনান্তে যখন ধ্যানের সময় উপস্থিত, তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অনেকেই বেগতিক দেখিয়া "ছুট্" দিলেন, কিন্তু শ্রীকেশবের চৈতন্য নাই! তাঁহার দেহ একটীবারও নড়িল না, নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির রহিল! সমাধির অতলতলে যাঁহার প্রাণ মগ্ন হইয়াছে সংসারের ঝড় তুফান তাঁহার কি করিবে?

(সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

৪। সর্প ও ভেক।

শ্রীকেশবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী "The Autobiography Of An Indian Princess" নামক গ্রন্থে একটী বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা গেল,—

"কলিকাতার অনতিদূরে আমার পিতার একটী বাগান-বাড়ী ছিল, তাহার নাম সাধন-কানন। আমরা এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করিতাম। কুটীরখানা ক্ষুদ্র

হইলেও চারিদিক্ তরুলতা ফলফুলে শোভিত ছিল। আমরা মুক্ত বাতাসে ফুলের মাঝেই বাস করিতাম; ফুলের সৌরভে সমস্ত পূর্ণ থাকিত। একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আমার সর্ব্বদা মনে হয়, মনে হইলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি, এবং বিশ্বাস না করিয়া পারি না যে পিতৃদেব মানুষের উপরে কিছু হইবেন। সাধন-কানন সর্পে পূর্ণ ছিল। এক দিন আমি আতাবৃক্ষের বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে পিতৃদেব যে স্থানে তাঁহার শিষ্যগণকে নিয়া ব্রহ্মসাধনায় মগ্ন ছিলেন সেই দিকে একটী ভেক অতি দ্রুতবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী সর্প ছুটিতেছে। ভেকটী লম্ফ প্রদান করিয়া পিতৃদেবের জানুর উপরে আশ্রয় নিল, এবং সর্পটী ঠিক সাম্‌নে গিয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক ভয়াবহ রূপে দুলিতে দুলিতে কিছুক্ষণ পরে নীরবে একদিকে চলিয়া গেল। ভেকও তাহার পবিত্র আশ্রয়স্থল হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য! অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রাণীও পিতৃদেবের কাছে গিয়া নিরাপদ! প্রকৃত পক্ষে কোন জীবই তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সহানুভূতি না পাইয়া ফিরিয়া আসিত না।”

প্রেমসুন্দর শ্রীহরির রূপসাগরে যাঁহার হৃদয় প্রাণ মন ডুবিয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট ভেকও যা, সর্পও তা।

৫। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি।

শ্রীকেশব মাঝে মাঝে একাকী বেলঘরিয়া তপোবনে গমন করিয়া নির্জ্জন সাধনে নিরত থাকিতেন। তাঁহার এই ভাবে তথায় অবস্থান কালীন এক দিন অপরাহ্নে নববিধানের কয়েকটী প্রেরিতপ্রচারক সেই পবিত্র স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু প্রিয়তম সমন্বয়াচার্য্যদেবকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখন অনতিদূরে ঝোপের আড়ালে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া ব্রহ্মরূপসুধা পান করিতেছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইভাবে নির্ম্মল যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে প্রেমাস্পদ শিষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার সমস্ত বদনমণ্ডল এক অপার্থিব স্নিগ্ধ জ্যোতিতে দীপ্ত হইয়া সন্ধ্যা-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এই রূপ আনন্দভোগ তাঁহার ভাগ্যে সর্ব্বদাই ঘটিত। (সাক্ষী—ভাই প্যারীমোহন)

৬। "ইনি ত মানুষ নহেন, ইনি দেবতা।",

সেসন্ জজ শ্রীযুক্ত এ, সি, সেন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী সুদক্ষিণা দেবী তাঁহার "জীবন স্মৃতি" গ্রন্থের এক স্থানে ব্রহ্ম-পূজায় মগ্ন ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"আমরা যে দিবস কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম, সেই দিবস সৌভাগ্যক্রমে রবিবার ছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সকলে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যখন গ্যালারীর উপর উঠিলাম তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। জীবনে এইরূপ দৃশ্য ত কখনও দেখি নাই। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বেদীতে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। আমার সোণাদিদি পশ্চাৎ দিকে পদদ্বয় রাখিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তিনি কেন ঐরূপ বসিলেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, 'ইনি ত মানুষ নহেন, ইনি দেবতা। দেখিতেছ না ইঁহার মুখ হইতে কিরূপ জ্যোতি বাহির হইতেছে? ঐ দিকে চরণ রাখিয়া কি বসিতে পারি?'...সকলই আশ্চর্য্য, সকলই স্বর্গীয়। এই স্বর্গশোভা দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ এবং কৃতার্থ হইয়া গেলাম।...ব্রহ্মমন্দির হইতে যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছি,—যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম।"— জীবনস্মৃতি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ "অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের" কথা আমি অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শুনিয়াছি। যাঁহার প্রাণে ব্রহ্মপ্রকাশের বিমল আলো নিরন্তর জ্বলিতেছে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যে জ্যোতি নির্গত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৭। গঞ্জা ও আনন্দময়ী মা।

শ্রীকেশব গঞ্জা খুব ভালবাসিতেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী ইহা জানিতে পারিয়া এক দিন অতি যত্নে গঞ্জা প্রস্তুত করতঃ ভক্তির সহিত তাঁহার সাম্‌নে রাখিলেন। তিনি গঞ্জা দর্শন করিবা মাত্রই তাহার ভিতরে আনন্দময়ী জননীর মধুর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া,—মা, তোমার এত দয়া। তুমি আমাকে এতই স্নেহ কর যে আমি গঞ্জা ভালবাসি বলিয়া নিজে ইহা প্রস্তুত করিয়া আনিলে!— এই ভাবের কথা বলিতে বলিতে মহাযোগে মগ্ন হইয়া গেলেন! যিনি গঞ্জা নিয়া আসিয়াছিলেন তিনি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। (সাক্ষী—ভাই মহেন্দ্রনাথ)

৮। রোগে "আনন্দ-সুধা।"

শ্রীকেশব তাঁহার মহাপ্রস্থানের দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে এক ভয়ঙ্কর শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। সন্ধ্যাকালেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইত; কাসিতে কাসিতে বুক যেন ফাটিয়া যাইত, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। কোন কোন দিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই নিদারুণ যাতনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত। আত্মীয়গণের অনুরোধে নানাপ্রকারের ঔষধ সেবন করিয়াও যখন কিছুতেই কিছু

হইয়া উঠিত না, তখন তিনি মহাসমাধিতে ডুবিয়া গিয়া তাঁহার আনন্দময়ী জননীর শরণাপন্ন হইতেন। মুহূর্ত্তের ভিতরে কাসি কোথায় চলিয়া যাইত! শরীর স্থিরভাব অবলম্বন করিত। সমস্ত মুখমণ্ডল এক অপার্থিব হাস্যপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত! তখন শ্রীকেশবের মত সুখী আর কে? (সাক্ষী—ভাই কান্তিচন্দ্র)

৯। ভূমানন্দ।

শ্রীকেশবচন্দ্রের কন্যা সাবিত্রী দেবী লিখিয়াছেন,—

"বাবা যখন উপাসনার সময় ধ্যান করিতেন, কতই মৃদু হাসি হাসিতেন। ভগবান্‌কে যে ঠিক সম্মুখে দেখেন তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

"বাবা একতারা লইয়া অনেকক্ষণ সমাধিযোগে মগ্ন থাকিতেন, শেষে যোগ ভঙ্গ হইলে আর ভাল করে খাইতে পারিতেন না।

পিতৃদেব যখন যোগেতে বিহ্বল হইতেন, তখন তাঁর হস্তপদ শীতল হইয়া যাইত। এক দিন আমি কমলকুটীরে বাবার ঘরে সুধাকে কোলে লইয়া বসিয়া বাবার পায়ে হাত বুলাইতে ছিলাম। শেষে দেখি পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ভগবানের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। এ রকম উচ্চ হাস্য আমি তাঁর মুখে কখনও শুনি নাই।...পরে যখন যোগভঙ্গ হইল তখন হাসি

থামিল। ভক্তবৎসলা ভক্তের সঙ্গে কত খেলাই খেলেন। কলিযুগেও তাহা দে'খে ধন্য হইলাম।"—

ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল)

ছেলের সঙ্গে মায়ের খেলা কি যে মধুর তাহা শ্রীকেশবই জানিতেন। ঐ শুন তিনি মহাভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁর আনন্দময়ী জননীর কথা বলিতেছেন,—

"আহা! মা আমারে বড় ভালবাসে,
স্নেহভরে মুখপানে চেয়ে হাসে;
আনন্দ-হিল্লোলে সদাকাল ভাসে,
কত কথা কয় সুমধুর ভাষে!
মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে,
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে,
ডাক্‌ব মা, মা, মা, মা, মা আমার।"

আনন্দময়ীর অকূল অতুল রূপ-সাগরে মগ্ন হইয়া তিনি আবার গাইতেছেন,—

"ও মুখে মধুর হাসি দেখিতে ভালবাসি।
হাসিতে হাতে হাতে স্বর্গ পাই;
মা তোর রূপে গুণে মোহিত হয়ে,
হেসে হেসে মরে যাই।"

যাঁহারা শ্রীকেশবের মহাপ্রস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে তিনি বাস্তবিকই তাঁহার আনন্দময়ী জননীর "রূপেগুণে মোহিত হয়ে হেসে

হেসে ম'রে গেলেন।" তাঁহার দেহ-গেহ থাকিতেও তিনি ব্রহ্মবাসী, আর যখন তাহা ভস্মে পরিণত হইল তখনও তাই। এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে, তাঁগার জীবন ও মরণ এক অনাকুল মহাসমাধি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মহাপ্রস্থান।

"লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম; এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম।"

—শ্রীকেশব (প্রার্থনা)

সংসারে রব উঠিয়াছে যে শ্রীকেশব পীড়িত। তিনি নিজে কিন্তু বুঝিয়া লইলেন যে এই সবই আনন্দময়ীর ফন্দী! ভক্তবৎসলা ভক্তশিশুকে আপনার অমৃত-বক্ষে তুলিয়া লইবার জন্য অস্থির, তাই কি চমৎকার ফাঁদই পাতিয়াছেন! এক দিন তিনি ঋষি গৌরগোবিন্দকে হাসিয়া বলিলেন, "এবার হাতী খাঁদে পড়িবে।"* এই একটী কথাতেই শেষ যবনিকা পতনের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

বাস্তবিকই শ্রীকেশবের নিকট আনন্দ-লোক হইতে

* গ্রন্থকার ঋষি গৌরগোবিন্দের মুখেই এই কথাটী শুনিয়াছিলেন

আনন্দময়ী জননীর ডাক আসিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তাই তিনি মহাপ্রস্থানের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার এখনো অনেক করিবার আছে। মা তাঁহাকে মহাকার্য্য সাধনের জন্য সংসারে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি তাহা একেবারে শেষ না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইবেন? ঐ শুন তিনি কি বলিতেছেন,—

"কেহ প্রভুর কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকে যাইতে পারে না, নববিধান এই ব্যাপার জগৎকে দেখাইবে।"—

সেবকের নিবেদন।

কি অদ্ভুত ভাবেই শ্রীকেশব তাহা দেখাইয়া গেলেন! রোগেতে তাঁহার শরীর জীর্ণ, মণ্ডলীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মন যারপর নাই ব্যথিত; কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাসের আগুন জ্বলিতেছে, এবং সমস্ত মুখমণ্ডল সায়াহ্নের স্নিগ্ধ আলোকে জ্যোতিষ্মান্। তিনি নবীনতর উৎসাহ এবং গভীরতর নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত মায়ের কার্য্য সমাপনে নিরত হইলেন।

ক। বিদায়-বাণী।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিনে শ্রীকেশব নিখিল মানব-মণ্ডলীকে আপনার প্রাণের শুভ ইচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলনবার্ত্তা

ঘোষণা করেন। এই অভিনব ঘোষণাপত্র (Epistle) তিনি এই ভাবে শেষ করেন,—

"Gather ye the wisdom of the east and the west, and accept and assimilate the examples of the saints of all ages.

"So that the most fervent devotion, the deepest communion, the most self-denying asceticism, the warmest philanthropy, the strictest justice and veracity and the highest purity of the best men in the world may be yours.

"Above all, love one another and merge all differences in universal brotherhood.

"Beloved brethren, accept our love and give us yours, and let the east and the west with one heart celebrate the jubilee of the New Dispensation."— New Year Day Epistle,

অখণ্ড মানবমণ্ডলীর সঙ্গে কেশব-হৃদয়ের ইহাই শেষ আদানপ্রদান!

১৯ দিন পরে অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী শ্রীকেশব এশিয়ার প্রতিনিধিরূপে বিপুলজনতাপূর্ণ টাউনহলে দাঁড়াইয়া ইয়োরোপকে প্রেমবিগলিত চিত্তে নববিধানের শেষ শান্তি-বার্ত্তা শুনাইলেন। এই সুসমাচারের শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন,—

"Come then, Europe, let us shake hands with each other with the utmost cordiality.

নববিধানের শেষ শান্তি-বার্ত্তা।

"Let us bury all our hostilities and enmities, and plant the sacred olive on their grave. Heaven demands reconciliation, let the earth obey."

Asia's Message To Europe.

কলিকাতাটাউনহলে ইহাই তাঁহার শেষ বাণী! এপ্রিল মাসে তিনি নববিধানের প্রেরিতবর্গকে "বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত" গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া এবং নবধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত ভার পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে যোগাচল হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, এবং বৈদিক যুগের ঋষিদের ন্যায় নিভৃতে তরুতলে বসিয়া মহাযোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকেশবের যোগানন্দরসপান কি যে অদ্ভুত ব্যাপার তাহার সামান্য একটু আভাস পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

হিমালয়ে নবযোগ সাধন—

"For some time past he had given special attention to the practice of Yoga. It was absorbed communion with the Spirit of God. ...This time at Simla the absorption took the

form of ecstacy. The conscious presence of a Supreme Loving Personality enraptured him. He cried, he laughed violently, he talked voceferously; he poured out all his troubles into the bosom of this Pitying Presence."
—Life Of Keshub Chunder Sen.

"Yoga, Subjective And Objective" নামক বিখ্যাত পুস্তক শ্রীকেশবের এই অদ্ভুত যোগ-সাধনার অপূর্ব্ব ফল।

হিমালয়ে অবস্থান কালীন শ্রীকেশব পরম দেবতার প্রেরণায় আর একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। নবমণ্ডলীর মঙ্গলোদ্দেশে "নবসংহিতা" প্রণয়ন কি যে মহৎ ব্যাপার তাহা পৃথিবী এক দিন বুঝিতে পারিবে। তিনি এই সম্পর্কে ৩১শে মে হিমালয় হইতে ঋষি গৌরগোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন—

"আমি এখানে নূতন সংহিতা লিখিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারি। ঋষিভাব উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু।...সংহিতা প্রভৃতি নূতন নূতন সত্য ইনি অনেক আনিয়াছেন। এস্থলে কেবল সত্য ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছা হয়। বোধহয় ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার এই স্থান। তোমরা সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মন্বাদি শাস্ত্রকার

হিমালয়ে "নবসংহিতা" প্রণয়ন

আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে সত্যাগ্নিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার প্রতি ভাইদের বড় আদর দেখিতেছি না। কিন্তু শত শত বৎসর পরে সেবকের পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার।"

(তারা বিউ—৩১।৫।১৮৮৩)

শ্রীকেশব ইহলোকের কার্য্য এক প্রকার শেষ করিয়াছেন। নিখিল মানবমণ্ডলীর সঙ্গে হৃদয়ের শেষ আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে, এবং পৃথিবী তাঁহার মুখে নববিধানের শেষ শান্তি-বার্ত্তা শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছে। নবীন আর্য্যবংশ তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে নববিধানের মহাভাব আত্মস্থ করিয়া সত্য, প্রেম ও পুণ্যের পথে অবাধে চলিতে পারে তাহার সাহায্যকল্পে তিনি নবসংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আর একটী মাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইলেই সংসারে তাঁহার আর কিছুই করিবার থাকে না। অনেক দিন হইতেই তাঁহার প্রাণে খুব ইচ্ছা হইতেছিল যে কয়েক খানা ইট কুড়াইয়া তিনি আনন্দময়ী জননীর পূজার জন্য এক খানি সুন্দর ঘর প্রস্তুত করেন, এবং একটীবার সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া মায়ের জয়গান করিতে করিতে জীবনের শেষ কথা মণ্ডলীকে বলিয়া যান।

এই শুভ সংকল্প প্রাণে রাখিয়া তিনি অক্টোবর মাসে হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার শরীর একেবারেই

"নবদেবালয়"
প্রতিষ্ঠা—শেষবাণী

ভগ্ন, কিন্তু হৃদয় প্রাণ মন স্বর্গের বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত। তিনি যোগবলে দৈহিক দুর্ব্বলতা জয় করিয়া "নব দেবালয়" নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। প্রত্যক্ষদর্শী মৌলানা গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্মৃতি লিপিতে এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মূল্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বেশী বলিয়া নিম্নে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"ভিত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর আচার্য্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে প্রত্যেক প্রেরিত কোদালী যোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবেন, তদনুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া কিছু কিছু ভূমি খনন করেন। ২৩শে কার্ত্তিক পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনার পর আচার্য্যদেব প্রেরিতদিগকে সঙ্গে করিয়া ভিত্তি স্থাপনের জন্য বহু ক্লেশে নীচে নামিয়া আইসেন। প্রার্থনান্তে স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও দুই এক খানা করিয়া ইট গাঁথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন।......প্রাচীর গাঁথা হইলেই প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রতি এই বিধি হয় যে তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেখানে শঙ্খ ও কাঁসর বাজাইবেন ও স্তোত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে নিয়মিতরূপে তাঁহা দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে যখনই প্রত্যূষে শাঁক কাঁসর বাজিয়া উঠিত, তখনই আচার্য্যদেব শয্যা হইতে উঠিয়া করযোড়ে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন।

"১লা জানুয়ারী এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। তখন আচার্য্যদেবের পীড়া ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই দিন প্রত্যূষে তিনি প্রেরিতদিগকে দেবালয়ে যাইয়া সঙ্গীতাদি করিতে বলেন। নববিধানাঙ্কিত ধাতুময়ী পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে ইঙ্গিত করেন। দেবালয়ের ভিতরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণানন্তর সম্মুখস্থ রোয়াকে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্যদেব বলিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃবন্দনার সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব শয়নাগারে জানালার দ্বারে চৌকিতে বসিয়া সেই মাতৃগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিকসিত পদ্মের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভরে করযোড়ে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর উপরে থাকিতে পারিলেন না। নীচে নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ চরণে ধরিয়াও ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর রুগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দেবালয়ে লইয়া যাইতে একান্ত বাধ্য হইলেন। একখানা চৌকিতে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া দেবালয়ে আনা হইল। যেই দ্বারে আসিলেন অমনি

উত্থানশক্তিবিহীন দুর্ব্বল শরীর সত্বেও 'মা এসেছি' বলিয়া মহা উৎসাহে করজোড়ে চৌকি হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে করজোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেদীতে যাইয়া বসিলেন ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিলেন।"

নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীকেশব যে কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার প্রিয় মণ্ডলী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।—

"প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘর খানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন; তোমরা একটী ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে।

শেষ বাণী

"ভাইরে, আমার মা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লিনে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্ পরলোকে গিয়ে দেখ্‌বি তাহা আদর ও যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার

শ্রী সৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ, সুস্থতা; বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ-সুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না! জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে!"

এমন ভাবে আনন্দময়ী জননীর কথা কেহ আর কোন দিন শুনাইবে না! শ্রীকেশবের এই শেষ বিশ্বাস-বাণী কাল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যুগযুগান্তরের ভিতর দিয়া অনন্তগামী মানবহৃদয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর তানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে! এই মহাবাণী আমাদের জীবনের বীজমন্ত্র হউক!

খ। মা আনন্দময়ীর বক্ষে।

নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার পরে শ্রীকেশবের পীড়া সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিল। কি যে এক দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা কিছুতেই দূর হইল না। শত শত ক্রুশে যেন তাঁহার অমন সুন্দর দেহখানি দিবা রাত্র বিদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু ধন্য তাঁহার বিশ্বাস! অদ্ভুত তাঁহার যোগপ্রভাব! সে অবস্থাতেও তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, "মা! আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে। তুমি যে রোগ দ্বারা আমাকে তোমার কোলে টানিয়া লইতেছ।" চরম কাল নিকট জানিয়া পুরস্ত্রীগণ এত অধীর হইয়া রোদন

করিতেছিলেন যে কোন শিষ্য ব্রহ্মানন্দদেবকে অনুরোধ করিলেন, "আপনি যদি কিছু বলেন তবে মেয়েদের মনে একটু শান্তি হয়।" তিনি উত্তর করিলেন,—

"আমি বৈকুণ্ঠের নূতন নূতন কথা ভাবিতেছি; আমি এখন তাহাই বলিব। তাহা বলিলে উহারা আরও কাঁদিয়া উঠিবেন।"

এক দিন তিনি সঙ্গীতাচার্য্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন,—

"প্রাণের ভাই আমার! তুমি আমাকে অনেক ভাল ভাল গান শুনিয়েছ। স্বর্গে গিয়া আবার আমি গান শুনিব। মা আমাদের জন্য ধ্রুবলোক প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

পরে কনিষ্ঠ সহোদর ও জ্যেষ্ঠের গলা ধরিয়া নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রয়াণের দুই দিন পূর্ব্বে তিনি মাতা সারদাদেবীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "মা! তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছনা আমি কার কোলে শুয়ে আছি? তুমি যেমন আমায় দুধ খাওয়াচ্ছিলে, তিনিও [আনন্দময়ী মা] আমায় তেমনি করে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

৭ই জানুয়ারীর রজনী কি ভয়ঙ্কর কাল নিশা! শ্রীকেশব মহাযোগে মগ্ন! বন্ধুবান্ধবগণ শোকে অভিভূত, পত্নী উন্মাদিনী, জননী মৃতপ্রায়, প্রেরিত ও সাধকবৃন্দ মহা বিষাদে অবসন্ন। শয্যাপার্শ্বস্থ শিষ্যগণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আকুল স্বরে প্রেমদাস ত্রৈলোক্যনাথকে গান করিতে

অনুরোধ করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী সঙ্গীত করিলেন। আশ্চর্য্য ব্রহ্মানন্দের বিশ্বাস ও ভক্তি! সঙ্গীতের অমৃতধারা যখন তাঁহার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল" তখন সেই রোগ-জর্জ্জরিত মলিন মুখমণ্ডল হাস্য-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! শেষ রাত্রিতে যখন সকলে সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিলেন তাহাতেও তিনি দিব্যজ্ঞানে যোগদান করিলেন।

পর দিবস (৮ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার) পূর্ব্বাহ্নে বেলা নয়টা তিপ্পান্ন মিনিটের সময় নববিধানের ভক্তশিশু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া মা আনন্দময়ীর অমৃতবক্ষে বিলীন হইলেন।

তাঁহার শ্বাসবায়ু নিঃশেষিত হইতে না হইতেই এক বিস্ময়কর দৃশ্য নয়নগোচর হইল। সেই রক্তশূন্য শুষ্ক মুখখানি সহসা নবরাগে রঞ্জিত হইয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হাসিতে লাগিল! ললাট এবং গণ্ডস্থল এক অপূর্ব্ব ধারণ করিল! সমস্ত বদনমণ্ডলে এক অপার্থিব জ্যোতি -চমকের মত দেখা দিয়া মর্ত্তবাসীকে যেন সঙ্কেতে

—

থ! মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃতের
বিমল বিভা!"

শান্তি! শান্তি!